চতুর্দশ বর্ষ • প্রথম সংখ্যা • বিজ্ঞান ও সমাজ বিষয়ক দ্বিমাসিক

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

শিক্ষাবাজার ও শিক্ষাপেশা
মিডিয়া ও গণমানস
ভূমিকম্প ও ক্যালিফোর্নিয়া
ভূপালে এখন
তৃতীয় বিশ্বের অন্য বই
ছড়া, চিঠি এবং…

বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত — জুলাই-আগস্ট 1990 — দাম দুটাকা

এই সংখ্যায় থাকছে

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

জুলাই-আগস্ট 1990

পৃষ্ঠা

- আমাদের কথা— 1
- কুলীন শিক্ষাপেশা ও শিক্ষাবাজার □ লতিকা গুহ 2
  - বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা কি সত্যিই শিক্ষার্থী অভিভাবক ও শিক্ষার কথা মনে রাখে? শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনের আচারব্যবহার কি প্রশ্নাতীত? এই সব নিয়ে একটি তীক্ষ্ণ পর্যালোচনা।
- ভূমিকম্পের একবছর পর : স্মৃতি ও ভবিষ্যত চিন্তা □ গৌতম ব্যানার্জী 9
  - শিক্ষণীয় আছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকেও। ভূমিকম্প বয়ে আনে ধ্বংস, ক্ষয়ক্ষতি, মৃত্যু। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতির সুযোগও এনে দেয় তা।
- মিডিয়া মনন ও মিথস্ক্রিয়া,—বিচ্ছিন্ন প্রতিভাস □ সুজয় মোদক 13
  - ভূমিকম্পের মতই গণমাধ্যম আছড়ে পড়ছে মানুষের জীবনে। আজকের শক্তিশালী গণমাধ্যমের সূচনা হল কি'ভাবে? কোন অর্থে এরা শক্তিশালী? মানুষ কি এদের হাতে ক্রীড়নক?
- ইউরোপ আমেরিকা ছাড়া অন্য দেশেও বই ছাপা হয় (তৃতীয় বিশ্বের বই) □ সংকলক রবীন চক্রবর্তী 19
  - গণমাধ্যমের আগ্রাসনে কোনঠাসা বই ও পড়ুয়া। কিন্তু তবুও প্রকাশিত হয় তৃতীয় বিশ্বের জন্য লেখা অন্য বই… … …
- ভূপালের গ্যাস পীড়িত মানুষের লড়াই আজও শেষ হয়নি □ রবীন চক্রবর্তী 21
  - ভূপালের পুনরাবৃত্তি চাই না, তাই ভূপালকে বিস্মৃত হলে চলে না। কারণ এখনও চলছে সেখানে জীবনের জন্য লড়াই।
- পরিক্রমা □ কেন এই ছলাকলা? নোবেল সাহিত্যিকের পরিবেশ চেতনা □ সংকলক বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইত 22
- রিপোর্ট □ সবুজ সংঘের বিজ্ঞান মেলা, বিজ্ঞান দরবারের ভ্রাম্যমান বিজ্ঞান প্রদর্শনী □ কাজল রায় 23
- চিঠি □ কলিকাতার পরিবহন ব্যাবস্থার বিশৃঙ্খলার জন্য কি ট্রামই দায়ী? □ দেবাশীষ ভট্টাচার্য 24
- ভেলকিবাজীর ছড়া : ছুমন্তর, গুরুবাদ, খবর, মুক্তি, ভেলকি…… □ নিশীথ চৌধুরী

আমাদের কথা

"দারুণ প্রলয়ের সূচনা হল, যুদ্ধের শঙ্খ বাজল"—প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নারকীয় বীভৎসতার পর পৃথিবীর কোটি কোটি সাধারণ মানুষের সবরকম শান্তি প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা করে দুদল লোভী, হিংস্র, শক্তিদম্ভী মানুষ আবার যুদ্ধ বাধাল। এ যুদ্ধ ইতিমধ্যে ভয়ঙ্কর "উপসাগরীয় যুদ্ধ" নামে আখ্যাত হয়ে উঠেছে সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে। সমর-বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নতি পৃথিবীর বাস্তু-সংস্থানের কি অপূরণীয় ক্ষতি করতে পারে, অসামরিক, অর্থনৈতিক ধর্মীয় ও সংস্কৃতি সাধনার কেন্দ্রগুলো কিভাবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হ'তে পারে, অসংখ্য নিরপরাধ সাধারণ মানুষের দুঃখময় মৃত্যুর কারণ হতে পারে—অত্যাধুনিক প্রচার মাধ্যমের দৌলতে তা প্রত্যক্ষ করে পৃথিবীর প্রতিটি সভ্য মানুষ আজ লজ্জায় ঘৃণায় প্রতিবাদমুখর দেশে দেশে। অন্যায় সেন্সরের নির্দয় কাটাকুটির পরও যে চিত্র আমরা প্রত্যক্ষ করছি তা থেকে একদল ক্ষমতালোভী যুদ্ধবাজ মানুষের অসভ্যতার বীভৎসরূপ কি নির্লজ্জভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে তা ভেবে আমরা শঙ্কিত। মিগ, মিরাজ—2000, জাগুয়ার, B -52, F—15, F—111 জঙ্গি বিমান, কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত স্কাড, পেট্রিয়ট, ক্রুইজ মিসাইল, লেজার নিয়ন্ত্রিত স্মার্ট, নিউট্রন বোমা, রাসায়নিক অস্ত্র, জীবানু অস্ত্র প্রভৃতির সাহায্যে যে ক্ষয়ক্ষতি, ধ্বংসলীলা চলতে পারে তা নিয়ে হিসেব নিকেশ চলছে সর্বত্র গভীর আশঙ্কায়।

উপসাগরের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত তৈলক্ষেত্রের কালো ধোঁয়ার মেঘ, সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত প্রায় 45 কিলোমিটার লম্বা 9 কি.মি. চওড়া এলাকাব্যাপী তেলের আস্তরণ,—নিকটবর্তী সমস্ত দেশের জল-স্থল-বায়ুমণ্ডলের স্থায়ী ক্ষতি করছে তো বটেই, এমনকি ভারত উপখণ্ডসহ সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার বাস্তুরীতিতেও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে। আবহাওয়াবিদদের মতে এশীয় মহাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের জলবায়ু ব্যবস্থা ও মৌসুমি বৃষ্টিপাতের উপরও প্রভাব ফেলবে জ্বলন্ত তেলের কালো ধোঁয়া। সমগ্র উপসাগরীয় অঞ্চলের মৎস্যসহ সমস্ত সামুদ্রিক জীবন বিপদগ্রস্ত। ঐ অঞ্চলের 90 শতাংশ মানুষের পানীয় জলের জন্য সমুদ্র জলের লবণাংশ দূর করার জলশুদ্ধি প্রকল্প ব্যবস্থাও ভেঙ্গে পড়বার মুখে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন অঞ্চলে শুরু হয়েছে বিষাক্ত কালোবৃষ্টি। গ্রীণপীস এর মুখপত্র ডরোথি স্মিথ, ফ্রেন্ডস অব্ দি আর্থ এর মুখপাত্র মার্ক হোয়াইটিস হেলম, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্যাট্রিক কলিনসন সহ সমগ্র বিশ্বের পরিবেশবাদী প্রতিটি সংগঠন, বিজ্ঞানী পরিবেশবিদ্ ও বিশেষজ্ঞ মানুষের মতে উপসাগরীয় যুদ্ধের পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি হবে বিশাল, ভয়াবহ। এ যুদ্ধের সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ হবে পৃথিবীর ভূতল, সামুদ্রিক বাস্তু-ব্যবস্থা। আশঙ্কা করা হচ্ছে ইরাকের বিধ্বস্ত পরমাণু চুল্লিগুলো ও রাসায়নিক কারখানা থেকে নির্গত ক্লোরিন, হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড, অ্যামোনিয়া ও বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় মৌলের প্রভাবে বহুদিন পর্যন্ত ইরাক দূষিত মরুভূমি হ'য়ে থাকবে। মারা যাবে, পঙ্গু হবে বহু সহস্র মানুষ। এ যুদ্ধ লজ্জা, আধুনিক বিজ্ঞানের, প্রতিটি বিজ্ঞানীর।

"পৃথিবীর সম্পদ নিয়ে ঠেলাঠেলি, কাড়াকাড়ি" প্রতিযোগিতার কারণেই এ পর্যন্ত পৃথিবীতে বহু যুদ্ধ হয়েছে, আজও চলছে। পৃথিবীর অগণিত সাধারণ মানুষ কখনো যুদ্ধ চায় নি, চায় না। শান্তিপ্রিয় নিষ্ঠাবান মানুষের সংস্কৃতি সাধনাই সভ্যতার ইতিহাস রচনা করে।

তবে বৈষম্যের বিরুদ্ধে ন্যায়যুদ্ধ চলেছে চলবেও, অন্যায় অসাম্য দূর না হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু তা অবশ্যই মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতা প্রদর্শনের আঙ্গিনা প্রস্তুত করে নয়, নারকীয় নরমেধ যজ্ঞের আয়োজন করে নয়, পৃথিবীর বাসযোগ্য পরিবেশ বিনষ্ট করে নয়। বিবেকবান সহনশীল মানুষের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় পারস্য উপসাগরীয় যুদ্ধ যেন বাস্তবিকই ঝড় তুলতে পারে মানুষের মননে, চিন্তা-চেতনায়। কারণ উপসাগরের ভাসমান তেলে আক্রান্ত বিষণ্ন মৃত্যু পথযাত্রী সামুদ্রিক পাখীটার মত সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি মানুষই আজ বড় ব্যাকুল শান্তির তীরে পৌঁছতে। □

কুলীন শিক্ষাপেশা ও শিক্ষাবাজার

লতিকা গুহ

মালিক-ম্যানেজার-গিনিপিগ

শিক্ষকরা (উভলিঙ্গে) শিক্ষা নিয়ে খুব বেশী ভাবেন না। কারণ শিক্ষা কেনা-বেচার বাজারে প্রবল প্রতিযোগিতার (কখনো কখনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা—উদাহরণ ঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান নির্বাচন) মধ্য দিয়ে এসে তারা চাকুরী পেয়েছেন। ইতিমধ্যেই চাকুরীটা নিতান্তই নিরেস 'মহৎ' বা 'নোব্‌ল' বৃত্তি শুধু আর নয়, রীতিমতো অর্থকৌলিন্যসম্পন্নও হয়ে উঠেছে—কোনো ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর আমলাদের সমকক্ষীয় হয়ে উঠেছে—এবং সনাতন নানা সুযোগ সুবিধাসহ। এ সবই ঘটেছে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার দৌলতেই। তাই শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে, শিক্ষা টিক্ষা নিয়ে বাজে কথা তাঁরা বলেন না। তাঁরা যথার্থই হিসেব করেছেন এবং দেখেছেন—এই শিক্ষাব্যাবস্থাই তাদের বৃত্তিকে অনেক অনেক বেশী অর্থকরী করে তুলতে সাহায্য করেছে। তাই অর্থের আবেশ আর মাহাত্ম্যের মুগ্ধতা কাটানোর কোনো লজিক থাকতে পারে না।

কিন্তু শিক্ষকদের সংখ্যা, শিক্ষকদের মালিকদের সংখ্যা অবশ্যই অনেক কম—সমস্ত শিক্ষাপ্রার্থী ও শিক্ষাগ্রহীতা ও তাদের অভিভাবকদের তুলনায়। শিক্ষা নিয়ে শিরঃপীড়া ব্যাপকভাবে এবং প্রধানত এদেরই। শিক্ষার মালিকদের (এদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষক বা একদা শিক্ষক ছিলেন) সঙ্গে শিক্ষকদের সম্পর্ক মোটের ওপর চমৎকার—বিশেষ করে তাদের সমিতি বা সংঘগুলির কর্মতৎপরতার দরুন। কিন্তু এদের পরবর্তী ধাপের যারা, সেই শিক্ষাগ্রহীতা এবং তাদের যারা মদৎ দিচ্ছেন সেই অভিভাবকদের সঙ্গে শিক্ষা মালিকদের কোনো সম্পর্কই নেই। এবং প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় সেরকম কোনো আবশ্যিক সম্পর্ক থাকার কোনো নিয়ম নেই এবং বাস্তবিকই এই কাঠামোতে থাকার কোনো প্রসঙ্গ বা প্রয়োজনও নেই।

শিক্ষাব্যবস্থা পাল্টানো বলতে যেটুকু ঘটে তা হচ্ছে সর্বসাকুল্যে 10+2+3 অথবা 10+2+2 এবং সিলেবাসে বিষয়বস্তুগুলো এলোমেলোভাবে এখন বা তখন ঢুকিয়ে দেওয়া বা বাদ দেওয়া, আর হঠাৎ হঠাৎ দেখা যায় শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে কিছু কিছু নূতন নূতন বিষয়ের বিভাগ খোলা হচ্ছে। একটা ভীষণ জরুরী প্রশ্ন নিয়ে প্রবল উত্তেজনা উঠেছিল—তা হচ্ছে মাতৃভাষার মাতৃদুগ্ধ পান করা দিয়ে শিশুশিক্ষা শুরু হবে কি হবে না। অবশ্য আরও একটা জিনিষ করা হয় মাঝে মাঝে—তা হচ্ছে পরীক্ষায় উৎরে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় মান নির্ণয়ের পদ্ধতিটির অদল-বদল—সোজা কথায়, কত নম্বর পেলে পাশ করবে বা ফেল করবে বা ব্যাক পাবে (এটি আবার পাশও নয়, ফেলও নয়)। —এই রকম সব পালটানো বা পরিবর্তন ঘটছে। ইতিমধ্যে আবার স্কুলগুলোর শিক্ষাবর্ষও পাল্টেছে। এসব কোন কিছুতেই কিন্তু এই শিক্ষা যাদের জন্য তারা থাকেন না। তাদের থাকতে বলাও হয় না। থাকার নিয়ম নেই। অথচ শিক্ষার যত বালাই এদেরকেই বহন করতে হয়—সে হেতুই এরাই প্রধানত ও ব্যাপকত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে প্রবল সন্দেহ প্রকাশ করে। এদের কোন প্রত্যক্ষ মালিক নেই, এদের কোন সংঘ বা সমিতি নেই—নেই কোন কৌলিন্য বা পরিচয়। কখনো কখনো এদের বলা হয় জনগণ। আসলে 'জনগণ' নামক কাল্পনিক মনোহর কোন অস্তিত্ব এরা নয়—এরা শিক্ষা নেয় বা নেওয়ার আশা প্রত্যাশা রাখে এবং এদের অভিভাবকরা নিজস্ব তহবিল থেকেই শিক্ষার ব্যয় বহন করে। এছাড়া এমনও লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে যাদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা নিচ্ছে না হয়তো, কিন্তু যারা সময়ের হাওয়া বদলটা টের পেয়ে সচেতন হয়ে উঠেছে—তাই চাইছে একটু যথাযথ শিক্ষা টিক্ষা হোক্‌—একটু সুস্থ স্বাভাবিক সংস্কৃতি ও সভ্যতায় সমাজটা যেন মোটামুটি বাসযোগ্য হয়ে ওঠে—যাতে ঢালাও প্রবঞ্চনার বন্যার তোড়ে দারিদ্র্য আর অবিচার মাথায় নিয়ে মানুষের বর্তমান আর ভবিষ্যৎ হয়ে উঠবে না নিরাপত্তাহীন এবং কদর্য্য এক অস্তিত্ব।

এরা সব চাইলে কি হবে—তিনি বা তাঁরা তো নড়েন না। এই শিক্ষা মালিক ও শিক্ষকরা নড়া চড়াটা বিশেষ ভালো চোখে দেখেন না। সেই বৃটিশ আমলের "হরধনু কে ভেঙেছিলো"—এই প্রশ্নোত্তরমূলক প্রহসনটি আজও অমলিনভাবে "শিক্ষা" নামক দিল্লীকা লাড্ডু-র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ জ্ঞানের প্রশ্নে ভাঁড়ে মা ভবানী অবস্থা অটুট—(ব্যতিক্রম নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই—তেরঙা স্বাধীনতার পর থেকে ব্যতিক্রমের সংখ্যা ও পরিমাণ ক্রমশই কমছে) এবং কে বা কারা এই অবস্থার জন্য দায়ী সে প্রশ্নের উত্তরও ঐ প্রহসনমূলক পরিণতিতেই নিয়ে যায়।

বামনাবতার

প্রকৃতির নিয়মে ছাত্ররা (উভলিঙ্গে) বড় হয়,—শরীর বাড়ে। বুদ্ধিও বাড়ে—কিন্তু—এই 'কিন্তু'-টা আসবেই কারণ শিক্ষার নিয়মে এই বুদ্ধি কয়েকটি মাত্র চৌখুপিতে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়—বুদ্ধি হয় বামন। এই চৌখুপিবদ্ধ বুদ্ধি নিয়ে নানা রকম 'ইক্স' ও 'লজি'র মারপ্যাঁচের মধ্য দিয়ে এসে কোন এক সুপ্রভাতে এই ছাত্রেরা অনেকেই হঠাৎ দেখে তারা ভোটাধিকারের বয়সটায় পৌঁছে গেছে—অর্থাৎ চারভাঁজ করা একটুকরো কাগজ একটা বাক্সে ফেলতে হবে। শিক্ষার শিরস্ত্রাণটা তাদের মাথায় বেশ চমৎকার ভাবে এঁটে বসেছে এখন তারা আর গিনিপিগ নয়—তারা এখন বানানো মুরগী—তারা এখন ভোটার। প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থার পক্ষে বেশ মানানসই মাপ ও মান নিয়ে বেরিয়ে আসে তারা।

এই ছাত্ররা যেহেতু হোমো স্যাপিএনস্ গিনিপিগ—তাই তারা বৌদ্ধিক বামন হবার প্রক্রিয়ার মধ্য থেকেই চতুষ্পার্শ্বের কিছু কিছু চাতুরী ধরে ফেলে। কিন্তু যেহেতু তাদের বামন হতে হবে এবং হতে হবে সুনাগরিক ভোটার—তাই তাদের কথা বলা বারণ। অর্থাৎ বাক্-স্বাধীনতা—মত প্রকাশের স্বাধীনতা—নেই। ঐ জিনিষটিতে ট্যাবু এঁটে দেওয়াটাই শিক্ষার নিয়ম।

ফলতঃ, বিশেষ বুদ্ধি লাগেনা এমন সব অভ্যাস ও সংস্কৃতি এরা অর্জন করে। স্কুল কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট কয়েকটি বই—তার নির্দিষ্ট কয়েকটি অধ্যায় ও পৃষ্ঠা এদের জ্ঞানের উৎস তথা শিক্ষার ভিত্তি—সেগুলিকে মুখস্থ করলেই এবং সেগুলি হুবহু শিক্ষক তথা পরীক্ষকের কাছে উগড়ে দিলেই শিক্ষিতও হওয়া যায়—জ্ঞানীও হওয়া যায়। তারপর তাদের মধ্যে কেউ কেউ—(এদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে নানা সরকারী বেসরকারী উন্নয়নকামী সংস্থাগুলির প্রয়োজনে ও সৌজন্যে) চলে যায় গবেষণায়—সেখানেও পূর্বার্জ্জিত শিক্ষা সংস্কৃতিরই প্রতিফলন দেখা যায়—সেই একই ব্যাপার চলে—এখন আর মুখস্থের ব্যাপার নয় যদিও—তবে স্ল্যাং-এ বলা যায় 'চোথা মারা' বা টুকে লেখা যা থেকে নূতন কিছু বিশেষ বের হয় না অথবা বের হতে দেওয়া হয়না। সমাজ বিজ্ঞান ও প্রকৃতি বিজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রের সব রকম গবেষণাতেই এই অবস্থা। নূতনতর ও প্রয়োজনীয়—মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয় কিছু বের হয় না, বের হতে দেওয়া হয় না। গবেষক ছাত্রদেরও পরিচালক এবং পরিচালকদের যারা মালিক—এরা, কেউই তেমন কিছু ফলাফল পছন্দ করেন না যা অন্যতর কোন সমাজের আশ্বাস আনতে পারে। অর্থাৎ গবেষণাগুলি এমনই হওয়া চাই যাতে বর্তমান অবস্থাটার তেমন যেন নড়চড় না হয় আর নিতান্তই যদি অবস্থাটা নড়েচড়ে ওঠে তাতে যেন পরিচালক আর তাঁদের মালিকদের সুনাম সমৃদ্ধিই পরিপুষ্ট হয়—নচেৎ সে গবেষণা না হবে গ্রাহ্য, না হবে সহ্য এবং অচিরাৎ এই সব গবেষক ছাত্রেরা হয় পাড়তাড়ি গুটিয়ে কোথায় যে হারিয়ে যায়, অথবা সন্ধি করে অবশেষে।—এই যে হারিয়ে যাওয়া, এই সন্ধি করা—এটা হঠাৎ ঘটে না—এর প্রক্রিয়া কিন্তু শুরু হয় এখন আড়াই বছর বয়স থেকেই! প্রায় কুড়ি বাইশ বছর ধরে—এদের সতেজ সহজ বিকাশ—এদের সব কিছু জানবার অধিকার—এদের সব কিছু বোঝবার প্রয়াস—এদের সব কিছু বলবার প্রবণতা—এদের সব কিছু করবার তাগিদ—এ সমস্ত কিছুকেই করে দেওয়া হয় নিরুত্তাপ নিষ্ক্রিয়। তানাহলে এরা চলতি কাঠামো-মাফিক হয়ে উঠবে না অথবা বড় গোলমাল বাঁধাবে নানা বেআদপি প্রশ্ন তুলে যা কিনা শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহের উস্কানিতে পৌঁছবে। তারচে বরং গোড়ায় মেরে দাও এবং তাইই ঘটে। তবে সবটাই যে কার্য্যকরী হয় তা নয়, কিন্তু প্রধানতই কার্য্যকরী হয়। জীবনের প্রথম কুড়ি বাইশটা বছর—ভীষণ মূল্যবান বছরগুলি—জীবনটাকে পরম ভালোবাসায় দেহে মনে জড়িয়ে বেড়ে ওঠার বছরগুলিতে প্রায় বোবা-কালা-হাবির-স্থানু হয়ে থাকার পর যখন এদেরই কেউ কেউ গবেষণা করতে আসে তখন তারা অনেক রকম সন্ধি করে বা ভবিষ্যতের সন্ধির আশ্বাস দিয়েই গবেষণা শুরু করে। নচেৎ হারিয়ে যায়।

সন্ধিই করুক বা হারিয়েই যাক—পরিণতিটার নাম অপচয়। মনুষ্যসম্পদ অর্থাৎ বুদ্ধি ও সৃজনী এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের কষ্টার্জিত অর্থের অপচয়। প্রথম দুটির অপচয়টা বুঝে ওঠা একটু জটিল হলেও তৃতীয়টি অতীব প্রাঞ্জল। ঐ মানুষগুলির সংখ্যা যেহেতু লক্ষ লক্ষ তাই সহজেই অনুমেয় যে এরা সমাজের একদম নীচের তলার বাসিন্দা। এরা শ্রমজীবী এবং এদের স্বোপার্জিত-সৎ-অর্থই প্রধানত 'কর' হয়ে মুনাফা হয়ে সরকারী বেসরকারী তহবিলকে পুষ্ট করে—আর এই তহবিলের একটা বড় অংশ জন্ম দেয় এই অপচয়ের। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য হতেই হয় বহু বছর আগে লেখা আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের বক্তব্য—যে দরিদ্র কৃষক খেয়ে না খেয়ে যে টাকা যোগায় তারই জোরে শিক্ষা বিভাগেও আভিজাত্য তৈরী হয়। এই বক্তব্য আজও সর্বাংশেই প্রযোজ্য। তবে আচার্য্য যা বলেছেন সে সত্যটা এই অপচয়যজ্ঞের সমস্ত পুরোহিতরা জানেন—কিন্তু বিচলিত হননা, কারণ এটাই বিধেয় এবং এই যজ্ঞে বলি প্রদত্ত তরুণ তরুণীরা যেহেতু বিশ্বাস করে এই ভাবেই তারা অজ্ঞানতার ও অভাবের আসান করতে পারবে তাই তারা যজ্ঞের আর্থিক মদৎ আসলে কোথা থেকে আসছে সেই পেছনকার বৃত্তান্তটা জানতে ইচ্ছুকও নয়, আর ইতিমধ্যে যেহেতু বৌদ্ধিক বামনাবস্থা তারা অর্জন করেছে সেহেতু জানা বা বোঝা তাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। অপর পক্ষে, এই ব্যাপারটার অন্য একটা করুণ দিক আছে। যে লক্ষ লক্ষ মানুষ আর্থিক মদৎ দিচ্ছে—এরা 'চন্দ্র বিন্দু বাদে' মানুষ—অর্থাৎ নিরক্ষর বা প্রায় নিরক্ষর অথবা স্বল্প স্বাক্ষর, এরা বিত্তহীন, জ্ঞানার্জন মূলক ভয়ঙ্কর মূল্যবান কর্মকান্ড থেকে শতশত যোজন দূরে এদের স্থান—তাই তারা

জানেইনা, বোঝেই না, তাই প্রশ্নও করে না—শিক্ষা গবেষণা বিশেষীকরণ ইত্যাদি কি এবং কারা এসব করে—কেনইবা করে—কোথায়ই বা করছে—কিইবা এর ফলশ্রুতি। আরও করুণ অবস্থা এই যে, এই মানুষগুলো জানেই না যে তাদের বিন্দু বিন্দু স্বেদ -তাদের ক্ষুধা-অশিক্ষা-অস্বাস্থ্যের মূল্যেই চলে ঐ অপচয়-যজ্ঞ।

এই অপচয়যজ্ঞ এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রবঞ্চনাকে ভন্ডুল যারা করতে পারে তারা কিন্তু ঐ যজ্ঞের বলি প্রদত্ত তরুণ তরুণীরাই, তারা কিন্তু ঘুরে দাঁড়াতে পারে — তারা কিন্তু অস্বীকার করতে পারে—তারা কিন্তু বর্জন করতে পারে। কিন্তু করে না। —কারণ, হয় তারা হারিয়ে যাচ্ছে —নয় তারা এখন বামনাবতার এবং সেই লক্ষ লক্ষ মানুষকে পায়ের তলায় চেপে ধরে তাদেরই শ্রমজাত নৈবেদ্যের চূড়ায় অধিষ্ঠান করে। এবং সেটাই না কি বিধেয়। খুব সম্প্রতি এরা প্রবল আন্দোলন শুরু করেছে "সংরক্ষণের" বিরুদ্ধে। অর্থাৎ এতকাল যে কায়েমী সুবিধা ভোগ করে এসেছিলো, সেটা হাতছাড়া করতে চায় না।

প্রশ্নহীন আনুগত্য, প্রতিবাদহীন অত্যাচার

এইরকম একটি অবস্থায় পৌঁছতে ছাত্রদের যা গ্রহন ও বহন করতে শিখতে হয় তার নাম আনুগত্য। তাদেরকে সব মেনে নিতে হবে—যা সুন্দর নয় এবং মিথ্যাও বটে তাকেও মেনে নিতে হবে। তাই বই-এ ভুল লেখা থাকলে বা অর্দ্ধসত্য ও মিথ্যা লেখা থাকলে বা যা লেখা থাকা দরকার ছিল তা না থাকলেও তাদের মেনে নিতে হবে। তাই পুলিশ মিলিটারির রেজিমেণ্টাশনের কায়দায় প্রতিষ্ঠান গুলোর নিজস্ব ইউনিফরম আছে—আছে ব্যাজ, পিঠে বা হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে ভারবাহী পশুর মতো স্কুলে যাওয়া আসা করা, ছোট ছোট ঘরে ছাগলগাদা অবস্থায় পাঠ নেওয়া, শিক্ষক ও শিক্ষামালিকদের রক্তচক্ষু শাসন ও দাপটের প্রকোপকে সহ্য করা এই সব অসুন্দরকে মেনে নিতেই হয়—এবং শিখতে হয় এ সবই নাকি অতি চমৎকার ও অতি আধুনিক সভ্যতার শর্ত। এই আনুগত্যের আন্তররূপের নাম আসলে দাসত্ব। এই শোভন-সংস্করণ দাসেরা ততই ভালো মূল্যে বিকোয় যতই দীর্ঘ দিন ধরে শিক্ষা নেওয়াটা চালিয়ে যেতে পারে। —অর্থাৎ 'সক্ষমের বাঁচবার অধিকার' —এই নিশ্চয়তাটা অর্জন করতে পারে। অতীতে দাসদের শিক্ষার অধিকার ছিল না, আজকে যে যত শিক্ষা নেয় সে তত দাস হতে পারে। (অথবা, সে তত মূর্খ হয়?)।

তাই কোন এক কো-এডুকেশন কলেজের প্রগতিশীল অধ্যক্ষ একদা ফরমান দিলেন ছাত্রীরা শাড়ী ছাড়া আর কিছু পোষাক পরতে পারবে না কারণ তা নাকি অশালীন, এবং সেই কলেজের বামপন্থী ছাত্র সংসদও তা মেনে নিলো। ছাত্রীরা রাগে অপমানে নিজেদের মধ্যে ফুঁসেছে—তারা জানে শাড়ীও কত অশালীন ভাবে পরা যায়! —তথাপি এই অত্যন্ত সংবেদনশীল বয়সের সেই সব মেয়েরা এই ফরমান মেনে নিয়ে ছিল সবিনয়ে!

চরিত্র সম্পর্কে ছাড়পত্র দেওয়ার সবচাইতে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিরা হচ্ছেন শিক্ষামালিকরা। তাই কোন এক কলেজের ছাত্রী যখন এই ছাড়পত্র নিতে গেছে—তখন কলেজে শিক্ষামালিকটির মনে পড়লো মেয়েটি কলেজের মাইনে কমানোর আন্দোলনে সামিল হয়েছিলো গতবছর —তাই তার চরিত্র খারাপ এবং চরিত্র তার আরও খারাপ এইজন্য যে আন্দোলন সমর্থনকারী কয়েকজন শিক্ষিকার বিরুদ্ধে সে সাক্ষী দিতে রাজি হয়নি। কাজেই মূল্যবান ছাড়পত্রটি সে আর সংগ্রহ করতে পারেনি। অথচ, যখন সে কলেজে পড়ছিলো, আন্দোলনে সামিল ছিল তখন তার বিরুদ্ধে বা অন্যদের বিরুদ্ধে সরাসরি কোন ব্যবস্থা নেওয়ার মতো বীর্য্য এই মালিকটি দেখাতে পারেননি। মেয়েটি ফিরে গিয়েছিলো, নীরবে।

বি. এ. ও বি. এস. সির ফল ঠিক সময়ে বের হয়নি—মেয়েরা প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়েছে—হয়ে উঠেছে কিছুটা অশান্ত—ছুঁড়ে ফেলেছে অফিসের ফাইলপত্র আর টেলিফোন। শিক্ষা মালিক ঠিক করলেন—এরপর থেকে কলেজে বড়লোক বাড়ীর মেয়েদেরই শুধু ভর্তি করা হবে (নিম্ন বিত্তেরা উচ্ছৃংখল?)। ছাত্রেরা গিয়েছিলো কলেজ মালিকের কাছে আবেদন নিয়ে যাতে পরীক্ষার রুটিনটা একটু পেছনো হয়। জনা দশেক ওরা—কয়েকটা কথার আদান প্রদান চললো—যেহেতু মালিকটি একান্তই একগুঁয়েমি করে বলেই চলেছেন যে পেছলে চলবেই না এবং তারপরেই মালিক বলে বসলেন যে তারা যদি এরকম ভীড় করে আসে তাহলে উনি পুলিশ ডাকবেন! ছাত্রেরা ফিরে এলো ক্লাশে নীরবে এবং ভয় পেয়ে! কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়া ছাত্রীটি অধ্যাপকের কাছে যাতায়াত করছিলো কিছুদিন ধরে গবেষণার পরিকল্পনা নিয়ে, কিন্তু যেহেতু ছাত্রীটি অধ্যাপকের পছন্দসই বিষয়বস্তু নিয়ে গবেষণা করতে রাজি হলো না—সেহেতু অধ্যাপক মহোদয় ভীষণ রাগ করলেন এবং বললেন তিনি ছাত্রীটির জন্য অন্য কোন বিষয়ে গাইড হতে পারবেন না, কারণ অন্য বিষয়গুলি দিয়ে তার নিজস্ব কোন লাভ নেই।

—বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শাখার এক অধ্যাপক সদ্‌ব্রাহ্মণ, শূদ্র ছাত্রছাত্রীদের খুবই হেয় করেন; কিন্তু কিছু তো বলা চলবে না—কারণ তিনি পরীক্ষার খাতা দেখেন!

—বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক ক্লাশে এসেই বলতেন "শেষের সে দিন ভয়ংকর"! (অর্থাৎ পরীক্ষা) এবং তারপর সামান্য ছোট ভাষণ এবং অতঃপর কিচ্ছু গল্পগাছা, অবশেষে প্রস্থান! ছাত্রছাত্রীরা নীরবে মেনে নিতো। - কোলকাতার প্রথম শ্রেণীর এক কলেজের দর্শন বিভাগে কয়েক মাস ধরে প্রথম বর্ষের ছাত্ররা জানতেই পারছে না কি বই তাদের পড়তে হবে বা কীই বা তাদের পাঠ্যসূচী! এই বিভাগে অবশ্যই আছেন এক বিশিষ্ট বামপন্থী সিনেট সদস্য! তিনিও আসেননি ক্লাশে এতদিন ধরে!

—কোন এক কলেজের অধ্যাপক এত ভয়ঙ্কর ব্যস্ত থাকেন সমিতির কাজে যে এক সময় তিনি হয়ে গেলেন বেতনহারা। সুতরাং অন্যান্য কলেজের সহকর্মীরা চাঁদা করে টাকা তুলে তাঁকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে তাঁর মহান দায়িত্ব পালনের ঋণ শোধ করেছিলেন। অবশ্যই ছাত্ররা তাঁকে ক্লাশে না পেয়ে নীরবই ছিলো।

—সরকারী এক স্কুলের প্রধানা শিক্ষিকা মহিলাটি ওমুক মন্ত্রীর আত্মীয়ের মেয়ে কি তমুক অফিসারের আত্মজাকে সহজ সরল খাতির দেখিয়ে ভর্ত্তি করাননা মোটেই। সুতরাং তিনি চিহ্নিত হলেন "প্রতিক্রিয়াশীল" বলে এবং বাধ্য হলেন একটি বেসরকারী স্কুলে চলে যেতে। প্রসঙ্গত এটা নিশ্চয়ই জেনে রাখা দরকার যে স্কুলে কলেজে ভর্ত্তির বিষয়ে মেধা একমাত্র শর্ত আর নয় (প্রতিটি শিশু ও তরুণের শিক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে—এ দাবি তো বিবেচ্যই নয়)—এ ব্যাপারে ছাত্র ইউনিয়নের কোটা, শিক্ষকদের কোটা, অফিস কর্মীদের কোটা, শিক্ষা মালিকদের কোটা ছাড়াও—আরও কয়েকটি বিষয় 'বিশেষ বিবেচনা' লাভ করে থাকে—তা হচ্ছে পুলিশ ও সরকারী কয়েকটি বিভাগের সুপারিশ ও অনুরোধ—কারণ শিক্ষকপ্রধান ও অধ্যক্ষদের সরল যুক্তি যে—এদেরকে প্রায়ই দরকার হয়, তাই এদের "হাতে রাখা" (অর্থাৎ মাথায় করে রাখা) উচিৎ! এসব ছাড়াও টাকার বিনিময়ে ভর্ত্তি হওয়াটা অতি পুরনো রেওয়াজ। এটাকে ঘুষ না বলে দান বলা হয়।

উপরের এইসব ঘটনাগুলোমাত্র কয়েকটি উদাহরণ—আসলে ব্যাপার-গুলো ঘটছে কিন্তু ব্যাপকহারে।

—প্রাথমিক স্তরে বেত ব্যবহার থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ন্যায্য কৃতিত্বলাভ বা গবেষণা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা পর্য্যন্ত সমস্ত রকম দুর্ব্যবহার ব্যাপক ও অবাধ গতিতে চলে স্কুলে স্কুলে কলেজে কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে। এর মধ্যে গত দুই দশক ধরে রাজনৈতিক কারণে দমন পীড়ন ভয়ঙ্কর আকার নিয়েছে এবং এ ব্যাপারে "অবাঞ্ছিত" "অবাধ্য" "অশান্ত" ছাত্রদের ঢিট করার জন্য আবার "ছাত্র সংসদ" গুলিকে প্রায়ই কাজে লাগানো হয়। সামন্তযুগীয় অভিজাত অভিজাত ভাব বজায় রেখে স্যার দিদিমনি বা ম্যাডামরা অত্যন্ত হেয় ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন ছাত্রদের এবং এমনকি নির্দ্বিধায় এরা প্রায়ই অভি-ভাবকদের সম্পর্কেও কটূক্তি বা অসঙ্গত ইঙ্গিত করে থাকেন এবং অভি-ভাবকদের সঙ্গে ব্যবহারটা নিছকই প্রভু প্রভু ভাবদ্যোতক। ছাত্ররা শুধু "গোরু গাধা"ই নয়, তারা "চোর জোচ্চোরও" বটে এবং তারা "বোকা গবেট", রিক্সাচালক বা মুটে মজুর বা আলুওয়ালা ইত্যাদি হবার যোগ্য (অর্থাৎ লেখাপড়া শিখলে শ্রমিক হয় না ও গাড়ী ঘোড়া চালায় না বা সব্জি বিক্রী করে না এবং এই সব কাজ বা সার্ভিসের সত্যিকারের সামাজিক প্রয়োজনও যেন নেই! বেশ বিপুল সংখ্যক মানুষের অশিক্ষিত থাকাটা যেন দরকারও—তানাহলে এসব বাজে বাজে "বুদ্ধিহীন" কাজগুলো কে করবে বলুন তো?)। শিক্ষকরা নাকি প্রত্যেকেই ভী-ষ-ণ ভালো ছাত্র ও সৎ ছাত্র ছিলেন—অর্থাৎ প্রত্যেকেই ভীষণ মনোযোগী ছাত্র ছিলেন, অসম্ভব স্মৃতিধর ছিলেন, ভালো মার্কস পেতেন এবং কক্ষনো টোকাটুকি করতেন না বা মুখস্থ বিদ্যা ঝাড়তেন না! সুতরাং তাদের তো হক আছেই ছাত্রদের হেয়জ্ঞান করার! সমস্ত শিক্ষককুলের কেমন যেন একটা দেবতা দেবতা ভাব, পবিত্র ভাব। তাই দেবতার মতো দাক্ষিণ্যে ছাত্রদের পাশ করান, দেবতার মতো রোষে ফেল করান অথবা পিটুনি দ্যান বা বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেন। তাই ছোট বাচ্চা মেয়েটার খাতা ছুঁড়ে ফেলে দিতেই পারেন ইংরেজী মাধ্যমওয়ালা স্কুলটির ম্যাডাম—কারণ খাতাটার চরিত্র নাকি "রেশনের দোকানের খাতার মতো"! ছোট্ট ছেলেটা গানটা গাইতে পারেনি গানের পরীক্ষায়—অভিজাত এক "পয়েন্ট"-ওয়ালা স্কুলের নামকরা সঙ্গীতজ্ঞা দিদিমনি ছেলেটির ঠোঁটের ওপর সজোরে স্কেলটা ঠুকে দিয়েছিলেন এবং ফল হলো এর পর থেকে গানের পরীক্ষায় দিন ছেলেটির আক্ষরিক অর্থে জ্বর পেটের ব্যথা শুরু হোত! একটা মেয়েদের কলেজের পবিত্রতা রক্ষার নিয়ম অনুযায়ী আড়াইটের আগে দরজা খোলা হবে না—তাই এক ছাত্রী পাঁচিল ডিঙিয়ে বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করলো; ধরা পড়লে একই বহিষ্কারের আদেশ হলো!—মেয়েটা প্রশ্ন করেছিলো—আচ্ছা, নির্দ্দিষ্ট ক্লাসগুলি না নিয়ে টিচাররা যখন বাড়ী বা অন্যত্র চলে যান—তখন কি তাদের বহিষ্কার করা হয়? —হয়না, কারণ পবিত্রতা জড়িয়ে আছে শিক্ষা তথা শিক্ষকের অস্তিত্বে। এমনটাই আজ রীতি হয়ে গেছে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে যে পাঠ্যসূচী অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়াটা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আর সম্ভব হয়ে উঠছে না—তাই গৃহ শিক্ষকতা ও কোচিং ক্লাসের ব্যাপক প্রসার ঘটছে।

আজকের ছাত্ররা আর বিস্মিতই হয় না যখন তারা দ্যাখে যে শিক্ষকরা ক্লাশে পাঠ্য বিষয়গুলি সবটুকুই ভালো করে না শিখিয়ে অনেকেটাই অজীর্ন অবস্থায় রেখে দিতে ছাত্রদের বাধ্য করেন যাতে অতঃপর তারা ভালো করে শেখার জন্য স্বতন্ত্র ভাবে, ব্যক্তিগতভাবে তালিম নেওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের দ্বারস্থ হয়। সকলেই এই স্বতন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে না—কারণ এর দাম খুবই বেশী। অথচ ক্লাসে কিছু শিখতে পারছে না। তাই কিছু সংখ্যক পরীক্ষায় টোকাটুকির আশ্রয় নিতে বাধ্য হবেই। যদিও টোকাটুকির পেছনে এটাই একমাত্র কারণ নয়, তবে অন্যতম কারণ তো বটেই।—ক্লাশের পরিবেশ হয়ে উঠেছে পরম ঔদাস্যে ভরা নৈর্ব্যক্তিক ও রুদ্ধ মানবিকতা সম্পন্ন সৃজনতাবিহীন এক জনসমাবেশ—যার জন্য কিছু অনুশাসন মাত্র আছে—নেই কোন প্রাণতাপূর্ণ ও গভীর তাৎপর্য্যময় লক্ষ্য। তাই ক্লাস হয়ে ওঠে না ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে সহজ বুদ্ধিদীপ্ত ও উৎফুল্ল লেনদেনের ক্ষেত্র। অধিকাংশ সময়ই তা হয়ে ওঠে একঘেঁয়ে পাঁচালী পাঠের আবহাওয়া, অথবা ধমকা ধমকি কিম্বা গল্প গাছার জায়গা।

কদাচিৎ ব্যতিক্রম নিয়ে গর্ব করা যায়, ভরসা করা যায় না।—এরই মধ্যে যা শেখানো হয় তা অনেক সময়েই ভুলে ভরা বা মিথ্যা প্রচার-মূলক তথ্য অথবা অর্ধসত্য কিম্বা সংক্ষিপ্ত সমাচার মাত্র।—ছাত্ররা এত বশ মানা পোষমানা যে এসব ব্যাপার বোঝেও না, বুঝলেও কিছু বলার সাহস রাখে না। কারণ তাতে ভবিষ্যৎ অবশ্যই অন্ধকার! এই 'ভবিষ্যৎ'টা কী? এক কথায় বলা যায় বিভিন্ন মাপের ও ধাঁচের 'চাকরী' বা 'কেরিয়ার'—কেরাণী থেকে মন্ত্রী। সুতরাং—একটু এ পাশ ও পাশ নড়া চলবে না। নড়লেই পতন! শিক্ষিত সমাজ অত নড়া চড়া পছন্দ করে না!

থোড়-বড়ি-খাড়া থোড় এবং আনুগত্যের দলিল

মেকলীয় শিক্ষা নীতি চেয়েছিলো একটি বিশ্বস্ত ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় যা কিনা ভারতে ইংরেজ প্রশাসনে নির্ভরযোগ্য সময়োপযোগী সহায়তা করতে পারবে—হয় কেরাণী হিসাবে, নাহয় বুদ্ধিজীবী হিসাবে; অনেক পণ্ডিত মনে করেন মেকলের উদ্দেশ্য মহৎ ছিল। নীতিটা অবশ্যই সফল হয়েছিলো, আবার কিন্তু প্রহ্লাদেরও জন্ম দিয়েছিলো অগোচরে। ইংরেজ প্রশাসনের জন্য মেকলে ছিলেন। এখনকার শাসন প্রশাসনের জন্যও আছেন অনেক মেকলে বা অনেক কমিশন। অনেক ভালো ভালো প্রস্তাব, অনুমোদন, সুপারিশের পাহাড় জমে উঠেছে। ডি. এস. কোঠারী '66-এর 19শে জুন বলেছিলেন শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট (1964-66) কিছু মৌলিক চিন্তা ও কাঠামোর অবদান রাখবে যা শিক্ষা বিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপকে সূচিত করবে। অবশ্য কমিশন শুরুতে গেয়েই রেখেছিলো যে এতসব কিছুর সুপারিশ কার্যতঃ সবটাই বাস্তবায়িত না হতে পারে যেহেতু জাতীয় ক্ষমতা ও সম্পদ সুপারিশগুলোর পক্ষে অকুলান হতে পারে এবং কমিশন খুবই সচেতন ছিলো যে খুব কিছু মৌলিক বা নূতনতর সুপারিশ রাখা সম্ভব হবে না। 1948-49 এ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন বা রাধাকৃষ্ণন কমিশনও একই রকম সুপারিশ বহুক্ষেত্রেতেই করেছিলো—কিন্তু কার্যতঃ কিছুই ঘটেনি। সেকেণ্ডারী এডুকেশন কমিশন বা মুদালিয়র কমিশনও (1952-53) দামী দামী বক্তব্য ও সুপারিশ রেখেছিলো।

এই কমিশন গুলি যাই বলুন না কেন শিক্ষা-সমস্যা নামক রোগের নানা উপসর্গকে তারা চিহ্নিত করতে পারেন, কিন্তু রোগটা আসলে যে কী এবং কোথায় তার উৎস, সেটা তারা ধরতে পারেন না বা পারলেও বলবেন না। কেননা বললে সরকারী বেসরকারী সমস্ত রকম প্রতিষ্ঠানগুলির শত্রুতে পরিণত হবেন এবং অ-নাথ বুদ্ধিজীবী হয়ে যাবেন। ফলতঃ কমিশনগুলির সুপারিশগুলো সমস্যার উপরিতল টুকুকেই শুধু ছুঁতে পারে, সামান্যতম গভীরে যেতেই পারে না। তাই কোটি কোটি মানুষের দেশে মাত্র 9000 জনের মতামত ও 2400টি স্মারকপত্র ইত্যাদিই যথেষ্ট মনে হয়েছে কোঠারী কমিশনের—যাদের জন্য শিক্ষা সেই বিশাল বিপুল জনসংখ্যার কাছে কমিশন এসে দাঁড়ায়নি—জানতে চায়নি তারা কী চায়। "রেফারেণ্ডাম" বা গণভোট নেওয়া এদেশে চলতেই পারে না। মুদালিয়র কমিশন যে "গণতান্ত্রিক শিক্ষার" কথা বলেছিলো তার জন্যও কোন গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ভিত্তিতে সুপারিশগুলো তৈরী করতে পারে নি। কোঠারী কমিশন যে সম্পদ আর দক্ষতার অপ্রাচুর্যের কথা বলেছিলো তা কি বাস্তবতঃ সত্য? দেশরক্ষার নামে কত কত কোটি টাকা যুদ্ধ সরঞ্জামের উপর বরাদ্দ করে থাকে কেন্দ্রীয় সরকার? তাছাড়া 'অপরাগতা' এমন একটা অজুহাত যে এর দোহাই দিয়েই অনেক কর্তব্য ও অনেক আশ্বাস প্রতিশ্রুতি থেকে নির্বিকারভাবে সরে থাকা যায়। 'বিজ্ঞান-ভিত্তিক শিক্ষা' কথাটা ধন্দমূলক এবং যথেষ্ট অস্পষ্ট। এর অর্থ কি বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভিত্তিক শিক্ষা অথবা বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার-ভিত্তিক শিক্ষা? প্রথমার্থে বিজ্ঞানের দর্শনটাই ভীষণ জরুরী হয়ে ওঠে, দ্বিতীয়ার্থে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক উপযোগটাই বড় হয়ে ওঠে এবং বাস্তবে এই দ্বিতীয় তাৎপর্যটাই একমাত্র গ্রাহ্য। বিজ্ঞান দর্শনটার দারিদ্র্য অত্যন্ত প্রকট। বিজ্ঞান আজ নিছক কেরিয়ারের প্রতিশ্রুতি আনে। আবার, বিজ্ঞান দাবী করে নিখুঁত শৃঙ্খলা আনুগত্য—প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা। তাই অনিবার্য পরিণতি হিসাবে দেখা যায় ছাত্রদের দাসত্বচর্চা। যা দেশের সর্বরকম মালিকেরই কাম্য ও প্রয়োজন। তাই সরকারী কমিশন বিজ্ঞানের ওপর জোর দেয়। সরকারী নীতি সে রকমটাই চায়। (কেন যে মাঝে মাঝে বিজ্ঞানীরা আত্মহত্যা করে!)। বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষার সঙ্গে যখন যুক্ত হয় ভারতীয় মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির সঙ্গে সাযুজ্য-সম্পন্ন হবার শর্তটি তখন অনড় ও বন্ধ্যা এক শিক্ষাব্যবস্থাই গড়ে তোলে। কারণ ভারতীয় মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি বলতে শিক্ষা-মালিকরা যা বোঝান তা এক অবিনশ্বর আদর্শের আদলে তৈরী চিরায়ত কিছু চালচলন ও ক্রিয়াকর্ম ও অভ্যাসমাত্র। এবং এই সংস্কৃতি ও মূল্যবোধে সত্যনিষ্ঠ হওয়ার পরিণতি অবশ্যই হাজারো রকমের কুআচার, মিথ্যাচার ও প্রশ্নাতীত দাসত্বের কাছে আত্মসমর্পন ছাড়া কিছু নয়। তাই শিক্ষা-ব্যবস্থার পরতে পরতে জড়িয়ে আছে ভারতীয় মূল্যবোধ অনুযায়ী ধর্মবিশ্বাস, ঈশ্বরবিশ্বাস, শ্রেণী ও জাতিভেদ, নারীপুরুষভেদ, শূণ্যগর্ভ জাতীয়তাবাদ তথা প্রাদেশিকতাবাদ, সনাতনী আচার আচরণ ও বিশ্বাস ও কর্তৃত্বের কাছে শর্তহীন আনুগত্য সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্দেশ।—এবং এসব ছাড়া সর্বোচ্চ শিক্ষা-মালিক অর্থাৎ সরকারের পক্ষে দীর্ঘ সময় ধরে দেশ-শাসন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। '86 সালের আগষ্টে প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া-শিক্ষানীতি অত্যন্ত সুচারুভাবে ও সুকৌশলে মূলতঃ এই উদ্দেশ্য নিয়েই রচিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই শিক্ষা-দলিলেই স্বীকার করা হয়েছে যে 2000

খৃষ্টাব্দে সমস্ত পৃথিবীতে সমস্ত নিরক্ষর মানুষের শতকরা ৫৫ ভাগ থাকবে এই ভারতেই তবু প্রতি জেলায় একটি করে মডেল স্কুল চালু করার প্রস্তাব রেখে এই দলিল আসলে মেকলীয় ধাঁচের এক বিশেষ সুবিধাভোগী শিক্ষার্থী তথা এক ভাবী বশম্বদ সেবক বাহিনী গড়ার সিদ্ধান্তই নিয়েছে। মোট রাজস্বের মাত্র এক শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় হয় আর এর এক সিংহভাগ ব্যয় করা হবে অবশ্যই মডেল স্কুলগুলোর জন্য নচেৎ আসন্ন আরও জটিল সামাজিক পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য আরও নির্ভরযোগ্য, বশম্বদ কিছু প্রকাশক, বিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠতে পারে না এবং এরাই পারবে সারা পৃথিবীর সবচাইতে বেশী সংখ্যক নিরক্ষর জনগণের ওপর সফল শাসন-প্রশাসন চালিয়ে যেতে। বার্ট্রান্ড রাসেলের ভাষায় "উপযোগবাদী জ্ঞানচর্চার" মাধ্যমে এমন এক নিরেট শিক্ষিত শ্রেণীর জন্ম হচ্ছে যারা আর যাই হোক দেশের অধিকাংশ মানুষের আত্মীয় নয়। এরা মূলতঃ কৌটিল্য ব্যঞ্জনা মাফিক "আহার্য্যবুদ্ধি" সম্পন্ন একটি সংখ্যালঘু কিন্তু ক্ষমতাশালী সম্প্রদায়ে পরিণত হচ্ছে। কোন এক বারাঙ্গণার ছেলেকে হিন্দু কলেজে ভর্তি হতে দেওয়া হবে না—এহেন জন্মসূত্রানুযায়ী শিক্ষানীতি প্রচলিত ছিল সেই বহুকথিত, বহুঘোষিত বেঙ্গল রেনেসাঁর যুগে (অবশ্য এর প্রতিবাদী শিক্ষাব্যবস্থার ধারাও গড়ে উঠেছিলো তখন) অর্থাৎ সমাজ ও রাষ্ট্র নির্দ্ধারিত শিক্ষাব্যবস্থা সবসময়ই চেয়েছে প্রচলিত ব্যবস্থাকে নিখুঁতভাবে বজায় রাখতে এবং ফলতঃ সেই শিক্ষা-ব্যবস্থা অবশ্যই জন্ম দেয় বশম্বদ কর্তাভজা শ্রেণীর অথবা নীরব ভীরু ব্যক্তিত্বহীন এক গোষ্ঠীর।

ভাঙরে ভাঙ আগল

কিন্তু এই ব্যবস্থাটাকে আর চলতে দেওয়া যায় না। এটা ধরে নেওয়া যায় না যে শিক্ষাব্যবস্থা মানেই তা প্রচলিত সব কিছুর ধারা-বাহিকতা বজায় রাখা মাত্র—তাই এটা সংকীর্ণ ও রক্ষণশীল হতে বাধ্য এবং তাইই যদি হয় তাহলে সার্বজনীন নিরক্ষরতাই আশীর্বাদ বলে মনে করা উচিত।

এই ধারাবাহিকতাকে ভাঙতে হবে। এমন এক শিক্ষা-দর্শন দরকার হয়ে পড়েছে যা প্রবলভাবে অস্বীকার করবে সমস্ত রকম সামাজিক ও প্রশাসনিক কর্তৃত্ববাদকে এবং সদাপটে মুখোশ খুলতে সাহায্য করবে শিক্ষার নামে মুষ্টিমেয় কিছু সুবিধাভোগী বশম্বদ এবং ভীরু ব্যক্তিত্ব হীন চাকুরী সন্ধানী তথা সামাজিক মর্য্যাদা প্রত্যাশী তথাকথিত শিক্ষিত জনতা তৈরী করার প্রয়াসের। এই দর্শন গড়ে উঠবে মোহভ্রষ্ট ও অসন্তুষ্ট মানুষগুলোর মধ্য থেকে—যে মানুষেরা এই শিক্ষার জাঁতা-কলের মধ্যেও আছে আবার বাইরেও আছে। কেউ কেউ এই জাঁতাকলের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীতে শিক্ষার বকলমে সমস্তরকম বুজরুকি ও বজ্জাতিকে চিহ্নিত করতে পারছে। এই দর্শন দাবি করতে পারে: (1) শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিটি বিষয় খুঁটিনাটি সহ নির্দ্ধারণ করবে দেশের প্রতিটি মানুষ (গণভোট, গণউদ্যোগ বা অন্য কোন প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এবং এতে নিছক তথাকথিত প্রাপ্ত বয়স্করাই শুধু অংশগ্রহণ করবে এমন নয়, কখনো কখনো কোন কোন প্রশ্নে একটা বয়স পর্য্যন্ত অপ্রাপ্তবয়স্করা অংশ নেবে) এবং এবিষয়ে সরকার বা প্রশাসন বা অন্য কোনরকম কর্তৃত্ব অনুপ্রবেশ ঘটাবে না; (2) চলতি উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিকে কোনও রকমে সম্প্রসারণ ও সমৃদ্ধ না করে সর্বোচ্চ ও সর্ববৃহৎ আর্থিক ও বৈষয়িক মনোযোগ দিতে হবে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষা সম্পর্কে (শিক্ষাখাতে বর্তমান ব্যবস্থায় ব্যয়বৃদ্ধি ঘটালে বাস্তবিক পক্ষে উচ্চশিক্ষা তথা উচ্চশ্রেণীর সুবিধাভোগী মানুষেরাই লাভবান হয়। তাই চলতি ব্যবস্থাতে ব্যয়বৃদ্ধি ঘটানোটা আদৌ আহামরি পরিণতি আনবে না, এমন কি বর্তমানের রাজস্বের যে সামান্য অংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় হয় তার অধিকাংশটাই যায় উচ্চশিক্ষার ফুটো পাত্রে।); (3) ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্কের ক্ষেত্রে দাতা-গ্রহীতার আদল আনা চলবে না—সম্পর্কটা হবে সেবামূলক অর্থাৎ সেবক-সেবিত সম্পর্ক এবং উভয়েই সম-সম্মানপদস্থ বলে গণ্য হবে। (4) নির্দ্দিষ্ট কোন শিক্ষা-মালিক বলে কিছু থাকবে না—অর্থাৎ হেড, রেক্টর, ভিসি ইত্যাদি পদ বিলোপ করে নিতান্ত যৌথ ও গণতান্ত্রিক দায়িত্ব চালু করতে হবে, অর্থাৎ নামকেওয়াস্তে গণতন্ত্র, অথচ কার্য্যত কর্তৃত্ববাদকে সমূলে উৎপাটন করতে হবে; (5) শিক্ষার কোন স্তরেই কোনরকম ব্যয় ছাত্ররা বহন করবে না—বহন করবে সমাজ; (6) যা কিছু শেখার ও শেখানোর তা যৌথভাবেই ব্যক্তিগতভাবে শেখান হবে এবং বিশেষ ব্যবস্থামূলকভাবে শিক্ষা দেওয়া বা নেওয়া বন্ধ করতে হবে, অর্থাৎ প্রাইভেট টিউশন ও স্পেশাল কোচিং জাতীয় বিচিত্র ব্যবস্থা তুলে দিতে হবে; (7) 'পরীক্ষা' নামক পরোক্ষ শাসন ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থাটা তুলে দিয়ে স্বচ্ছন্দ ও সহজ পদ্ধতিতে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান ছাত্রদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে এবং ছাত্ররা তা যথার্থভাবে শিখলো কিনা তা শেখানোর মধ্য দিয়েই শিক্ষক হিসেব করে নেবে এবং শেখার নানা রকম মান ঠিক করে নিয়ে শিক্ষকরা যৌথভাবে নির্দ্ধারণ করবে কে কতটা এগিয়ে বা পেছিয়ে আছে এবং পেছিয়ে থাকাদের এগিয়ে আনার জন্য অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে না এনে সকলের সঙ্গে একই সঙ্গে রেখেই তাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। বছরওয়ারী শ্রেণী ব্যবস্থা তুলে দিতে হবে। একটা নির্দ্দিষ্ট শিক্ষাসূচী এক সঙ্গে কয়েক বছর ধরে (ধরা যাক 6 বছর বয়স থেকে ষোল বছর বয়স পর্যন্ত) অনুসরণ করা হবে এবং এই দশ বছরের সূচী যে একদল ছাত্র শুরু করলো সেই দল থেকে কাউকেই বাদ দেওয়া হবে না পেছিয়ে আছে বলে, অর্থাৎ পাশ-ফেল প্রথা তুলে দিতে হবে। মান নির্দ্ধারণের জন্য বর্তমান লুকোচুরি মার্কা বা মুখস্থ বিদ্যা বাজিয়ে দেখার মতো পরীক্ষা ব্যবস্থার বদলে ছাত্রদের প্রয়োজন মতো বই বা পত্রপত্রিকা দেখে সামনাসামনিই উত্তর বলা বা লেখার ব্যবস্থা চালু করতে হবে (নকল বা টুকে লেখার অধিকারের দাবি

সম্প্রতি কর্ণাটকের ছাত্ররা তুলেছে। তাছাড়া ব্যাপকভাবে টুকে লেখার প্রবণতা বা ঘটনাগুলি এদেশে ও বাংলাদেশে এমনভাবে ঘটছে তাতে একথা ভাবতেই হচ্ছে যে প্রচলিত শিক্ষাদান পদ্ধতি তথা পরীক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটানো দরকার। যেহেতু ঘটনাগুলি ব্যাপকভাবে ঘটছে তাই তা সমাজতাত্ত্বিকভাবে বিবেচনাযোগ্য বিষয় এবং এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়—কারণ এর প্রবণতা বা এর প্রতি সমর্থন অধিকাংশ ছাত্রদেরই আছে এবং অধিকাংশ ছাত্র নিশ্চয়ই অসৎ বা শিক্ষালাভে উদাসীন হবে এটা মনে করা অবৈজ্ঞানিক। তাছাড়া, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমনকি অংক শাস্ত্রতেও, মুখস্থ করে না দেখে উগড়ে দিলেই ছাত্রটি যথাযথ শিখেছে প্রমাণ হয় না, বরং মুখস্থ করার পারদর্শিতাই প্রমাণ হয়। আর যারা তথাকথিত কঠিন কঠিন বড় বড় থিসিস লিখে বিশাল বিশাল খেতাব পায় তারা মূলত নানা রকম বই পত্র পত্রিকা দেখেই লেখে, এমন কি বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রতেও মৌলিকত্ব বা যথার্থ জ্ঞানের পরিচয় তো অধিকাংশ ক্ষেত্রতেই থাকেনা।) শিক্ষাসূচী শেষ হলে প্রতিটি ছাত্রকে সমাজের বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করতে হবে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। বিভিন্ন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও ক্ষমতা অর্জনের জন্য তথা-কথিত উচ্চশিক্ষা জাতীয় ব্যবস্থা তুলে দিয়ে কার্য্যক্ষেত্রগুলোতে শিক্ষা বা ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা ও প্রয়োজন মাফিক ও প্রাসঙ্গিক গবেষনা চালু করতে হবে। সংরক্ষণ বিরোধীরা প্রতিটি তরুণের শিক্ষার অধিকার এবং জীবিকার অধিকার নিয়ে আন্দোলন কখনো করেনিতো ?

এইসব প্রস্তাবের সম্ভাব্য সমালোচনা কী হতে পারে তা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। অনেকেই বলবেন আমূল সামাজিক পরিবর্তন ছাড়া এসব সম্ভব নয়। কেউ বলবেন প্রস্তাবগুলিতে এ্যানার্কিজমের প্রশ্রয় আছে। অথবা এতবড় দেশের পক্ষে এভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয় ইত্যাদি। সম্ভাব্য উত্তরও কি তাহলে এমন হতে পারে না যে সমাজ ব্যবস্থার কবে আমূল পরিবর্তন হবে তার জন্য বসে থাকার অর্থ হয় না এবং তাছাড়া, এহেন শিক্ষা ব্যবস্হাই তো সমাজ পরিবর্ত্তনকে ত্বরান্বিত করবে, অথবা এ্যানর্কিজম হলেই বা দোষ কি যদি তাতে ব্যক্তির মুক্তি তথা সুস্হ সমাজ নিশ্চিত করা যায় ? কিম্বা দেশটা যত বড়ই হোক, আঞ্চলিক ভিত্তিতে নূতন দর্শনের আলোতে নূতন শিক্ষাপদ্ধতি চালু করা যেতেই পারে।

আসলে মনে রাখাই দরকার যে ফাটা ডিমে তা দিয়ে সময় শ্রম অর্থ আশাকে নষ্ট না করে বরঞ্চ নিটোল নূতন ব্যবস্হা আনাটাই জরুরী এবং একটুও আর দেরী না করে। □

গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র ও অন্যান্য সংগঠনের উদ্যোগে

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন

পথসভা

স্থান : শিয়ালদহ

সময় : বিকাল ৪ টা

তাং : ২. ২. ৯১ শনিবার

ফেস্টুন সহ উপস্থিত হতে হবে।

ভূমিকম্পের এক বছর পর ঃ স্মৃতি ও ভবিষ্যত চিন্তা

গৌতম ব্যানার্জী

17ই অক্টোবর 1989 বিকাল 5টা। 6-তলা বাড়ীর 4-তলার ল্যাবরেটরীতে গবেষণার কাজকর্ম তখনও জোরকদমে চলছে। আমার পাশের বেঞ্চের কর্মীটি কাজের সাথে ট্রানজিস্টারে সানফ্রানসিস্কোর কেনডেলস্টিক পার্কে আয়োজিত বেসবল টুর্নামেন্টের খেলার প্রাক-ধারাবিবরণী শুনে যাচ্ছে। খেলা তখনও শুরু হয়নি। কয়েক মিনিট পর আমি খানিকটা বেঁকে নীচু হয়ে একটি যন্ত্রের কাজ নিয়ন্ত্রন করতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ এক ঝাঁকুনিতে হুমড়ি খেয়ে যন্ত্রের গায়ে গিয়ে পড়লাম। সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই টের পেলাম যে সারা বাড়ীটাই দোলনার মতো দুলছে। ছুটে গিয়ে একটা টেবিলের নীচে ঢুকলাম। এভাবে চললো প্রায় 10 সেকেন্ড। এতো দুলুনীসত্বেও কিন্তু ঐ 6 তলা বাড়ীর ভিতরে বা বাইরে কোন ক্ষতি হলো না। এর কারণ পরে আলোচনা করছি। ইতিমধ্যে ধারা-বিবরণী বন্ধ হয়ে গিয়ে জরুরী ঘোষণা করে জানানো হলো যে সানফ্রানসিস্কো থেকে 100 মাইল দক্ষিণে সান্তাক্রুজ পাহাড়ে অবস্থিত লোমা-প্রিয়েটাকে কেন্দ্র করে একটি ভূমিকম্প (রিক্টার স্কেলে 7.1) হয়ে গেছে। কিছু বিহ্বল মুহূর্ত্ত কেটে যাওয়ার পর সম্বিত ফিরে পেয়ে চারিদিকের পরিস্থিতি ঠাহর করার চেষ্টা করলাম। এখানকার রেডিও ও টেলিভিসনের প্রায় প্রত্যেক চ্যানেলের একটি নিয়মিত কাজ হলো সকাল-বিকাল হেলিকপ্টারে চড়ে সার্ভে করা এবং স্যাটেলাইটের সাহায্যে আবহাওয়া ও ট্রাফিক পরিস্থিতি জানানো। ওরাই প্রথম ভয়াবহ খবরটা জানালো যে ওকল্যান্ড শহরের উপর দিয়ে এবং সানফ্রানসিস্কো-উপসাগরের ওপর দিয়ে যে দুটি দোতলা হাইওয়ে ব্রীজের মতো চলে গেছে, তার উপর তলাটির কিছু অংশ ভেঙ্গে পড়েছে এবং অনেক গাড়ী যাত্রীসহ মাঝখানে আটকে বিধ্বস্ত হয়েছে। পরে আরও জানা গেল যে মেরিনা শহরের একাংশ গ্যাসলাইন ফেটে আগুন লেগে পুড়ে ছাই। ক্ষতি ও দুর্ঘটনার সমস্ত বিবরণ ধীরে ধীরে আসতে লাগল।

ডলারের হিসাবে ক্ষতির পরিমান 7-10 বিলিয়ন। প্রাথমিক হিসাবে মৃতের সংখ্যা 300 মনে হলেও ক্রমশঃ সে হিসাব কমে কমে 62তে এসে দাঁড়ালো। তাছাড়া 35000 জন আহত হন এবং প্রায় 12000 লোক সাময়িকভাবে গৃহহীন হন (এদের অনেকেই ভূমিকম্প-বীমার দৌলতে গৃহ ফিরে পাবেন)। এইসব হিসাব মর্মান্তিক হলেও বিশেষজ্ঞদের মনে কিছু আশা-ভরসা ও উদ্দীপনা অনুভব করার সুযোগ রেখেছে। কিসের আশা-ভরসা? সেটাই এই রিপোর্টের বক্তব্য।

এই প্রসঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার আর্মেনিয়া রিপাবলিকে 1988 সালের 7ই ডিসেম্বর যে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয় তার কথা স্মরণীয়। এই ভূমিকম্পের (6.8-7 0 রিক্টার ভূকম্পন হয় প্রায় 20 সেকেন্ড ধরে) সাথে লোমা-প্রিয়েটার ভূমিকম্পের (7·1 রিক্টার ভূমিকম্প হয় প্রায় 10 সেকেন্ড ধরে) বেশ কিছুটা তুলনা চলে, যদিও আর্মেনিয়ার ঐ ভূকম্পন প্রায় 10 সেকেন্ড বেশীক্ষণ ধরে চলে। ক্ষতির দিক থেকে অবশ্য এই দুটো ভূকম্পনের কোন তুলনা চলে না। আর্মেনিয়ায় 25000-এর বেশী লোক মারা যান এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমান দাঁড়ায় প্রায় 15 বিলিয়ন ডলার। তাছাড়া প্রায় লক্ষাধিক পরিবার আহত ও গৃহহীন হন। সেই তুলনায় সানফ্রানসিস্কো-উপসাগরীয় অঞ্চলে প্রানহানির সংখ্যা নগণ্য। তার মূল কারণ বড় বড় অট্টালিকা বাড়ীঘর ভেঙ্গে পড়ার ঘটনা তুলনায় ঘটেছে অনেক কম, যদিও বিজ্ঞানীরা এখন হিসাব করে দেখেছেন যে যদি ভূকম্পন আরও 10 সেকেন্ড বেশী হতো তাহলে ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশী হতো। কিন্তু এখানে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য তা হলো বহুদশকের প্রচেষ্টার ইতিহাস যা সানফ্রানসিস্কো তথা গোটা কালিফোর্নিয়ায় ভূমিকম্প-জনিত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নূন্যতম রাখায় সাহায্য করেছে এবং বর্তমান অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে আরও বেশী কার্যকরীভাবে সাহায্য করবে। আজ সারা আমেরিকা কালিফোর্নিয়ার এই প্রচেষ্টা এবং সাফল্য থেকে শিক্ষা নিচ্ছে। আশা করা যায় গোটা পৃথিবী একদিন এই শিক্ষা নিতে সমর্থ হবে।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যখন আমেরিকার উত্তর ও দক্ষিণের রাজ্যগুলি গণযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো, প্রায় সেই সময় দেশ-বিদেশের স্বর্ণ-সন্ধানীরা পশ্চিমে কালিফোর্নিয়ায় এসে চষে বেড়াতে থাকে (এই প্রসঙ্গে চার্লি চ্যাপলিনের "গোল্ড রাশ" চলচিত্রের কথা স্মরণ করা যেতে পারে) এবং সেক্রামেন্টোতে স্বর্ণখনির গোড়াপত্তন করে। এই-সব বিদেশীদের (অধিকাংশই স্প্যানীশ, পর্তুগীজ ও অন্যান্য ইউ-রোপীয়ান) একাংশ সানফ্রানসিস্কোয় এসে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে ও ব্যবসা বাণিজ্য চালু করে। ক্রমশঃ এমন এক নগরী গড়ে ওঠে

যা প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরের চারপাশের ভাগ্যান্বেষীদের লক্ষ্য-স্থল হয়ে ওঠে।

কিন্তু 1906 সালের ভূমিকম্পে সানফ্রানসিস্কোর সেই অগ্রগতির স্রোত সাময়িকভাবে গতিরুদ্ধ হয়। সেই ভূকম্পনে (8.25 রিক্টার) অট্টালিকা ভেঙ্গে পড়ার চেয়ে ভয়াবহ রূপ নেয় গ্যাসলাইন ফেটে আগুন লেগে যাওয়া। সেই আগুনে প্রায় সমস্ত শহর পুড়ে ছাই। যদিও মাত্র 700 লোক মারা যায়, সম্পত্তির ক্ষতি হয় বর্তমান মূল্যে 20 বিলিয়ন ডলার (তখনকার হিসেবে 0·5 বিলিয়ন)। ঐ ভূকম্পন কালিফোর্নিয়াবাসীদের এমনভাবে নাড়া দেয় যে শুধুমাত্র সানফ্রানসিস্কোকে পুনরায় গড়ে তোলা নয়, সারা কালিফোর্নিয়াকে এই রকম প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে কি করে রক্ষা করা যায় সেই সব চিন্তা ও পরিকল্পনা দানা বাঁধতে থাকে। বলাবাহুল্য, সাধারণ জনগণের দৈনন্দিন জীবনধারা ও সাবেকী চিন্তাধারার মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন চেতনা আনা এক কঠিন কাজ। বিশেষকরে সময়ের সাথে যখন দুর্ভোগের স্মৃতি ঝাপসা হয়ে আসে এবং মানুষ আবার তার ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার গণ্ডির মধ্যে ফিরে যায়।

কিন্তু বিজ্ঞানী, স্থপতি ও বিশেষজ্ঞদের তো ইতিহাস ভোলা চলে না। তাদের কাঁধেই সমস্ত দায়িত্ব বর্তে যায়। শুরু হয়ে যায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে গভীর গবেষণা ও তথ্য-সংগ্রহের কাজ যা আজও চলেছে তুমুল-ভাবে। স্বার্থান্বেষীদের শত বাধা সত্বেও সেইসব সংগৃহীত তথ্য রাজ-নীতিবিদদের প্রভাবিত হতে বাধ্য করে। ফলে নগর পরিকল্পনার কাজে তথ্যভিত্তিক নতুন আইন চালু ও প্রয়োগ করা এবং গবেষণার ক্ষেত্রে অর্থব্যয় করার প্রয়াস অব্যাহত থাকে। যে দুটো ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে এই সব তথ্য সংগ্রহের কাজ চলেছে এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রয়োগ করা হচ্ছে তা হলো, (ক) ভূতাত্ত্বিক গঠন ও প্লেট-টেকটনিক প্রক্রিয়ার বিশ্লেষন করা এবং ভূকম্পনের সম্ভাবনা সম্পর্কে পূর্বাভাষ পাওয়া, (খ) অট্টালিকা, মাটির নীচ দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তাঘাট ও পাইপলাইন, ব্রীজ, উড়ালপথ এং পাতালরেল প্রভৃতির ভিতও গঠন ভূকম্পন সহ্য করার ক্ষমতা সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে উন্নত কারিগরী পদ্ধতির উদ্ভাবন করা।

ভূতাত্ত্বিক গঠন ও তার প্রভাব ঃ—

1906 সালের ভূমিকম্পের পর থেকেই ভূতত্ত্ববিদ ও ভূকম্পন বিশারদরা দশকের পর দশক উন্নত থেকে উন্নততর যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই উপসাগরীয় অঞ্চলে ভূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে তথ্য সংগ্রহ করে চলেছেন। তার মধ্যে যে কয়েকটা মূল্যবান তথ্য সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক তা হলো—(1) কালিফোর্নিয়ার উত্তর দক্ষিণে (তার মধ্যে সানফ্রান-সিসকো ও লস এঞ্জেল্স শহর দুটো অন্তর্ভুক্ত) 8000 মাইল ব্যপী এবং 11 মাইল গভীর যে "সানএণ্ড্রিয়াস ফল্ট" আছে তাকে ঘিরেই সব বড় বড় ভূকম্পন হবে। এই ফল্ট আসলে প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেট ও উত্তর আমেরিকার প্লেটের মিলনস্থলের একাংশ যা কিনা প্রতিবছর কয়েকইঞ্চি করে পরস্পরের গা ঘেঁষে নড়াচড়া করে। এই রকম নড়াচড়ার ফলে যে চাপ বা টেনস্ন সৃষ্টি হয় তা বছরের পর বছর জমে জমে একটা মাত্রার বাইরে গেলে ভূমিকম্পের আকারে আত্মপ্রকাশ করে তবে প্রশমিত হয়। একই অঞ্চলে উত্তর আমেরিকার প্লেটে আরও দুটো ছোট ফল্ট আছে। সবমিলে গোটা অঞ্চলে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা প্রবল করে তুলেছে। 1906 ও 1989 সালের দুটো বড় ভূকম্পের মাঝে কয়েকশত ছোট ছোট কম্পন এই সান এণ্ড্রিয়াস ফল্টের ধারে কাছেই হয়ে গেছে। (2) 1906 সালের পর হিসাব করা হয়েছিল যে 2000 সালের মধ্যে অন্ততঃ একটা বড় ভূমিকম্প এই উপসাগরীয় অঞ্চলে হবেই। 1989 সালের 7·1 রিক্টার কম্পনের পর আবার হিসেব করে জানা গেল যে এটাই সেই প্রত্যাশিত বড় ভূকম্পন নয়। আগামী 30 বছরের মধ্যে আরও বড় একটা ভূকম্পন (8·0 রিক্টার মাপের) হওয়ার 60-70 শতাংশ সম্ভাবনা রয়ে গেছে। কাজেই 1989 সালের ভূকম্পনের অভিজ্ঞতা আগামী ভয়ানক দিনটির জন্য আরো ভালো করে প্রস্তুত হয়ে থাকার সুযোগ এনে দিল। এখন চারিদিকে সাজ সাজ রব। যে কয়েকশত যন্ত্রপাতি 1989 সালের ভূকম্পনের নারিনক্ষত্র ধরে রেখেছে, বিজ্ঞানীরা তার বিশ্লেষণ করে প্রাণপণ বোঝায় চেষ্টা করছে যে মূলকম্পনের কিছু আগেই তার পূর্বাভাষ পাওয়া যায় কিনা। দীর্ঘ-সময় আগের পূর্বাভাষ (Long term prediction) যদিও মোটামুটি সঠিক ভাবে ধরা যাচ্ছে অল্প-সময় আগের পূর্বাভাষ (short term prediction) ধরা নিয়ে এখন সবার মাথাব্যথা হচ্ছে। সম্প্রতি ষ্ট্যানফোর্ড ইউনিভারসিটির একজন বিজ্ঞানী লক্ষ্য করেছেন যে 1989 সালের ভূমিকম্পের ঠিক আগেই একটা "রেডিও ওয়েভ" ভীষণভাবে সাড়া দিয়ে উঠেছিলো। সেটা কাকতালীয় না ভূকম্পনের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা প্রমাণ করার জন্য বিজ্ঞানীরা উঠেপড়ে লেগেছেন। যদি এই সম্পর্ক সত্যি প্রমানিত হয়, তাহলে পূর্বাভাষের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক অগ্রগতি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। (3) সারা অঞ্চলের বিস্তৃত ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরী করে জানা গেছে কোন কোন অঞ্চলের ভূস্তর কতটা দুর্বল এবং কোন কোন অঞ্চলের কম্পন সহ্য করার ক্ষমতা কতটা। দুর্বল অঞ্চলগুলির ভূ-প্রাকৃতিক গঠন ও দুর্বলতার কারণও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই সব মূল্যবান তথ্য সাহায্য করেছে ভূকম্পন সহ্য করার ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজাইন তৈরী করার যা উত্তরোত্তর রাস্তাঘাট, ইমারত, উড়ালপথ, পাতালরেল প্রভৃতিকে রক্ষা করার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভূকম্পন-সংক্রান্ত কারিগরী কৌশলের উদ্ভাবন ও প্রয়োগের মাধ্যমে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা হচ্ছে।

বিল্ডিং কোড, রিট্রোফিটিং এবং ভূকম্পন-সহ্য করার ক্ষমতা-সম্পন্ন ডিজাইনের কার্য্যকারিতা ঃ—

(ক) পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভূমিকম্প-জনিত ক্ষয়ক্ষতির বিশ্লেষণ করে যে দুটো বিষয়ে সকলে একমত হয়েছেন তা হলো—(1) যেখানে বৃহৎ ইমারত তৈরী হবে তার নীচের জমির কোন স্তরে যেন চাপে বা নড়াচড়ায় তরলীকরণ (Liquefaction) না হয়। তা হলে ভূকম্পনের প্রভাব এর নিকটবর্তী এলাকায় আরও পরিবর্ধিতরূপ অনুভূত হবে। অবস্থাটা অনেকটা ভেজা বালির মধ্যে একটি দণ্ডকে পুঁতে দিয়ে উপরের অংশটা নাড়ালে যেমন হবে। যে সমস্ত জমি কোন এককালে কাদা-বালি দিয়ে ভরাট করে তৈরী হয়েছে সেখানে এই সম্ভাবনা রয়েছে। এরকম জমিতে শুধুমাত্র বাড়ীঘর নয়, মাটির নীচদিয়ে চলে যাওয়া গ্যাসলাইনও একেবারে নিরাপদ নয়। ওকল্যাণ্ড শহরের দোতলা উড়ালপথ ভেঙ্গেপড়া, মেরিনা শহরে বাড়ীঘর বিধ্বস্ত হওয়া এবং গ্যাসলাইন ফেটে আগুন লেগে যাওয়ার কারণ এটাই। কাজেই, ফল্টের কাছাকাছি এই ধরণের জমি থাকলে সেখানে কোন কাঠামো তৈরী করতে গেলে বিশেষ সতর্ক ব্যবস্থা নিতে হবে। এবং জমিকে উপযুক্তভাবে মজবুত করে নিতে হবে। (2) যে কোন কাঠামোকে বড় ধরনের ভূকম্পন সহ্য করতে হলে এমনভাবে তৈরী করতে হবে যাতে গোটা কাঠামোটা একক-ইউনিট হিসাবে সাড়া দেয় (কেননা যে কোন এক অংশ অপর অংশের চেয়ে বেশী বা কম নড়লে যে "সিয়ারিং" জনিত চাপ সৃষ্টি হয় তাতেই কাঠামোটা ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনা) এবং কম্পনের তালে নড়েচড়ে বসার একটু সুযোগ যেন ভিত-গঠনের মধ্যে থাকে। ব্যবস্থাটা যেন বাড়ীর ভিতের নীচে চাকা জুড়ে দেবার মতো। একটা কাঠামোকে ভূকম্পন সহ্য করার জন্য মজবুত করতে গেলে শুধুমাত্র উচ্চমানের ইস্পাত ও প্রি-কাষ্ট কংক্রীট ব্যবহার করলেই চলবে না। ছাদ, দেওয়াল ফ্লোর ও ভিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জুড়ে দেওয়ার কারিগরী কৌশলও রপ্ত করতে হবে। বার্কেলেতে আমাদের 6 তলার গবেষণাগার এইরকম পদ্ধতিতে তৈরী করা হয়েছিল বলে অনেকক্ষণ ঝাঁকুনি খেয়েও ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি। সানফ্রানসিস্কোর ডাউন টাউনে বঙ্যাক অব আমেরিকার 52 তলার বাড়ীটি একই কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি।

(খ) কালিফোর্নিয়ায় বিল্ডিং কোড চালু করে যে সমস্ত নিরাপদ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত তার প্রয়োগের চেষ্টা নিষ্ঠা সহকারে করা হয়। কিন্তু ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও অধিকার-সচেতন সমাজে আপামর জনসাধারণ বা ক্ষমতাধর ও বিত্তশালী ব্যক্তিদের উপর কোন বিধিনিষেধ উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া সহজ নয়, তার জন্য দীর্ঘদিনের বোঝাপড়ার প্রয়োজন। কাজেই বিল্ডিং কোডের প্রয়োগ এখনও সুসম্পন্ন নয়।

(গ) নিরাপদ করার আর একটি উপায় হলো রিট্রোফিটিং (Retrofitting)। যে সমস্ত পুরনো কাঠামো বিল্ডিং-কোড মাফিক তৈরী করা সম্ভব হয়নি, তাদের মজবুত করার জন্য বাইরে থেকে আলাদা করে বীম, পিলার, নাট-বল্টু লাগিয়ে জুড়ে দেওয়া সম্ভব যাতে গোটা কাঠামোর প্রতিটি অংশ পরস্পরের সাথে শক্তভাবে এঁটে থাকে। এটাও একটা আলাদা কারিগরী কৌশল। অর্থব্যয় করে যেখানে যেখানে রিট্রোফিটিং করা হয়েছিলো, ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত এলাকায় সেই সব কাঠামো ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পেয়েছে। এই ধরনের ফলাফল বিশেজ্ঞদের মনে পরিকল্পনা ও ডিজাইনের ব্যাপারে অনেক আস্থা জাগিয়েছে।

(ঘ) 1989 সালের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে বার্কেলেতে অবস্থিত ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার বিজ্ঞানী ও কারিগরেরা বিশাল বিশাল ক্রেন ও জ্যাকের সাহায্যে নাড়িয়ে নাড়িয়ে কৃত্রিম উপায়ে ভূমিকম্পের মতন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দেখছেন ব্রীজ, উড়ালপথ ও ইমারতের কাঠামোয় দুর্বলতাগুলো কোথায় কোথায় রয়েছে এবং কেন। এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্য একটাই। আগামী 8·0 মাপের বড় ভূমিকম্পের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকা। বিশেষজ্ঞ মহলে প্রবল ভরসা রয়েছে যে বর্তমান অভিজ্ঞতাকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগিয়ে ব্যবস্থা নিলে আসন্ন বড় ভূমিকম্পকে সম্মান জানালেও তার সামনে অসহায়ভাবে মার খেতে হবে না।

বলা বাহুল্য এত সব গবেষণা, প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনার পিছনে প্রচুর অর্থব্যয় করতে হয়েছে এবং হচ্ছে যা একমাত্র কালিফোর্নিয়ার পক্ষে সম্ভব। তবু ভেবে আশার আলো পাওয়া যায় যে মানুষ তার নিজের প্রচেষ্টায় এতবড় একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার পথ তৈরী করে নিতে পারছে। এখানকার অভিজ্ঞতা যে ভিত তৈরী করে রাখছে হয়তঃ ভবিষ্যতে পৃথিবীর আরও দেশ এই পথে সামিল হতে পারবে। □

ছু মন্তর

ছু মন্তর ছু
দিলাম জোরে ফুঁ,
পালাবে সব কু।
অসুখ যাবে সেরে
হাজার টাকা দেরে,
ফোড়ন কাটে কেরে ?

গুরুবাদ

কবচ তাবিজ মাদুলি
সঙ্গে গুরুর পা-ধূলি,
পেলেই জীবন ধন্য
সর্বসুখের জন্য
গুরুবাদের বন্যা
ভারতমাতা ধন্যা।

Please Dial for Your Mattress, Pillows, Cushions etc.

Office : 610503
Resi. : 560872
Show Room : 241660

TOUCH DOLPHIN FOAM ❀ FEEL IT AND YOU WILL LIKE IT TO FEEL AGAIN

☆

DOLPHIN FOAM INDUSTRIES PVT. LTD.

Manufacturers of Quality Latex Foam, Mattress, Pillows, Cushions etc.

(REGD. NO. 38721 OF 85 WB)

Vill.—Uttar Mouri (Chakrabarti Para)
P. O.—Andul-Mouri
HOWRAH-711302

মিডিয়া মনন মিথস্ক্রিয়া : বিচ্ছিন্ন প্রতিভাস

—সুজয় মোদক

জেমস ওল্ডস ছিলেন পেশায় মনস্তাত্ত্বিক। বেশ কিছুকাল হল উনি কাজ করছিলেন জীবজন্তুদের পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতার ওপর। তিনি ঠিক করলেন ইঁদুরদের মস্তিষ্কের একটি বিশেষ অংশে তড়িৎ প্রবাহ চালিয়ে দেখবেন ইঁদুরটি পরিবেশ সম্বন্ধে কতটা সজাগ হয়ে ওঠে। সেদিন বোধ হয় ওঁর ঘাড়ে সেরেণ্ডিপের যুবরাজের* ভূত চেপেছিল। তাই ঠিকঠাক জায়গায় আর তড়িৎ প্রবাহ পাঠানো হল না। তার বদলে এমন একটা জায়গা উদ্দীপ্ত হল যে ইঁদুরটা ভারি উৎফুল্ল হয়ে বারবার পরীক্ষকের কাছে ঘুরেফিরে আসতে থাকল, আর একটু উদ্দীপনার লোভে। পরে জানা গেল মস্তিষ্কের ঐ বিশেষ জায়গাটি ছিল লিম্বিক এরিয়ার অন্তর্গত সুখানুভূতির সদর দপ্তর। এবং ইঁদুরেরা যদি নিজেরাই লিভার টিপে ঐ এলাকায় বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠানর সুযোগ পায় তবে তো তাদের পোয়াবারো। আহারাদি ক্রিয়া মাথায় উঠল। সব ফেলে মাথায় বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠাতেই ইঁদুরেরা ব্যস্ত হয়ে পড়ত, মাঝে মধ্যে খালি ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ত, জেগে উঠে আবার ঐ একই কাজের পুনরাবৃত্তি। এই যে পর্যবেক্ষণ এর প্রতিতুলনা মিলবে (না, বেশী দূর যেতে হবে না) এই আমাদেরি ঘরে। সন্ধ্যের পর যখন রিমোট কন্ট্রোলটি হাতে নিয়ে দূরদর্শন যন্ত্রটি নিয়ন্ত্রণ করেন তখন কিন্তু আপনি নিজের অজান্তে ঐ ইঁদুরটির অল্টার ইগো হয়ে যাচ্ছেন, এখানেও একই লক্ষ্য প্রমোদ অনুসন্ধান এবং খেয়াল করে দেখবেন আপনি কিন্তু এই প্রমোদ প্রবাহ থামাতে পারছেন না। এই পর্যন্ত পড়ে অনেকেই নিশ্চয়ই আস্তিন গুটোচ্ছেন, বলছেন মানুষের এতবড় ডি-হিউম্যানাইজেশান সহ্য করা যায় না। কোথায় ইঁদুর আর কোথায় স্বাধীন চিন্তার উত্তুঙ্গ প্রতিভূ মানুষ। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখুন প্রমোদ গ্রহণ ছাড়া মিডিয়ার কাছে কি আমাদের আর বিশেষ কোনো চাহিদা আছে? সব মিলিয়ে একটা দুষ্টচক্র তৈরী হয়েছে। আমরা চাইছি বলেই মিডিয়া প্রমোদ সরবরাহ করছে। আবার মিডিয়া প্রমোদ সরবরাহ করছে বলেই আমরা প্রমোদ চাইতে অভ্যস্ত হচ্ছি। প্রশ্ন উঠবে আমাদের জীবনে প্রমোদের কি কোনো মূল্যই নেই? নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তা যেন জীবনের অন্যদিকগুলোকে খাটো না করে, শিক্ষার দিকটাকে অবহেলা না করে। অথচ আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? কেবলমাত্র বিনোদন। আর তা ক্ষুণ্ণ করছে আমাদের পারিবারিক জীবন, খর্ব করছে আমাদের সামাজিক সত্তাকে, এমনকি ব্যক্তির নিজের সঙ্গে নিজের নিভৃত কুজন, তার সৃজনশীলতার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য অবকাশ তাও আজ প্রায় উধাও। ঐ ইঁদুরদের মত আমরাও জীবনের সমস্ত স্বাভাবিক আর অপরিহার্য কাজ ফেলে মেতে উঠেছি অস্বাভাবিক ভাবে সুখানুভূতির কেন্দ্রে বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠাতে।

এই প্রমোদ দুভাবে কাজ করছে। প্রথমতঃ তা মানুষকে নিষ্ক্রিয় করে রাখছে, এখনকার দিনের জ্বলন্ত সব সংকটগুলো থেকে আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে রাখছে। দ্বিতীয়তঃ প্রমোদ কাজ করছে ট্রয়ের ঘোড়ার মত। আপাতদৃষ্টিতে এই কাঠের ঘোড়া হয়ত কারো কাছে তুচ্ছ খেলার সামগ্রী। কিন্তু পেটের ভেতর ঠেসে পোরা আছে শাসক শ্রেণীর হাত শক্ত করার মত বেশ কিছু কালচারাল কোড। আপনি যখন প্রমোদ পেতে ব্যস্ত থাকবেন তখন এই কালচারাল কোডগুলো কাজ শুরু করবে নিঃশব্দে, (যেমনটা গদার বলেছিলেন, আপনি যখন অবসরের আনন্দ উপভোগ করেন তখন ফ্যাসিজম এসে প্রবেশ করে সন্তর্পণে)। এই কোডগুলো জগৎ সম্বন্ধে আপনার ধ্যানধারণাগুলোকে একটি বিশেষ উপায়ে গঠন করে দেবে, খাও, পিও আর জিও এই নীতি আপনার মস্তিষ্কে সুপ্রোথিত হবে। না হলে যে এই সব কোডের স্রষ্টাদের খানা, পিনা, জিনার মুশকিল হয়ে উঠবে।

"সব মিলিয়ে একটা দুষ্টচক্র তৈরী হয়েছে। আমরা চাইছি বলেই মিডিয়া প্রমোদ সরবরাহ করছে। আবার মিডিয়া প্রমোদ সরবরাহ করছে বলেই আমরা প্রমোদ চাইতে অভ্যস্ত হচ্ছি।"

আজকে মিডিয়ার ভূমিকাই হয়ে দাঁড়িয়েছে মানুষের মস্তিষ্ককে কব্জা করা। ভাবলে অবাক হতে হয় যে এই বিপুল অর্থব্যয় শুধু মানুষের তেরোশ সি.সি. পরিমাণ মস্তিষ্কের দিকে তাক করে রয়েছে (তাও পুরোটা নয়, শুধুমাত্র গুরুমস্তিষ্কই তার উদ্দিষ্ট)।

মিডিয়া যে খুব সচেতনভাবে এই কাজটা করছে তা কিন্তু নয়। কিন্তু তার অবস্থাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে মলিয়েরের নাটকের সেই রাজার মত যে নিজের অজান্তেই সারাজীবন নাকি গদ্য বলে এসেছিল।

তেমনি আজকে গণমাধ্যমগুলো যা প্রচার করছে তাই অনেক সময় অজ্ঞাতসারে হয়ে দাঁড়াচ্ছে পণ্যসংস্কৃতির বাহক।

এতক্ষণ যেটুকু আলোচনা হল তা প্রায় সবটাই চালিত হয়েছে ক্রিটিক্যাল মিডিয়া থিওরিস্টদের দৃষ্টিকোণ থেকে। এই যে গণমাধ্যম আজকে হয়ে দাঁড়িয়েছে শাসকশ্রেণীর মতাদর্শ প্রচারের যন্ত্র (আলথুসেরের ভাষায়, ইডিওলজিক্যাল স্টেট অ্যাপারেটাস) একথা এই ফ্রাংকফার্ট স্কুলের প্রবক্তারা যথেষ্ট যুক্তিবত্তার সঙ্গে উদ্ঘাটিত করে চলেছেন। এঁদের পুরোভাগে রয়েছেন Adorno, Horkheimer প্রমুখ বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক। মিডিয়া বিষয়ক যে কোন সিরিয়াস আলোচনায় এই ধারাটির প্রাধান্যই দেখা যায় সবচাইতে বেশী।

রবীন্দ্রনাথ কোথায় যেন একবার আক্ষেপ করে বলেছিলেন তাঁর লেখায় যেখানে হাঁটুজল সেখানে লোকে অনেকসময় গলাজল বলে ভুল করে। ঠিক তেমনি মিডিয়ার অধিকাংশ বার্তা থেকে কোনো নিগূঢ় রাজনৈতিক অর্থ নিংড়ে আনার যে চেষ্টা দেখা যায় তা ঐ হাঁটুজলকে গলাজল বলে ভুল করারই সামিল। মনে রাখতে হবে মাধ্যমগুলির একটা নিজস্ব নন্দনতত্ত্ব আছে এবং তা অনেকটাই শ্রেণীবিবিক্ত (Extraclass)। কোন কবিতায় যেমন দাঁড়, কমার ব্যবহার বিশেষ কোনো শ্রেণীদৃষ্টি অনুসারে চালিত হয় না, তেমনি মিডিয়ার যাবতীয় প্রয়োগকুশলতা সব সময়ই যে বিশেষ শ্রেণীর লেজুড়বৃত্তি করে তা নয়।

বাস্তবতা হচ্ছে একটা বহুমাত্রিক জিনিস, তাকে তো আর যাবতীয় জটিলতা নিয়ে হাজির করা যায় না দূরদর্শন বা চলচ্চিত্রের পর্দায়। দূরদর্শন কর্তৃপক্ষকে এই জঙ্গমতাকে সুবিধাজনকভাবে কাটছাঁট করে নিতেই হবে। দরকার হবে বিশেষ ধরণের ফ্রেমিং-এর বিশেষ ক্যামেরার কোনের। এই যে চতুষ্কোণ পর্দায় বহুভুজ বাস্তবতাকে বন্দী করা হল বিশেষ কিছু কৃৎকৌশলের সহায়তায়। এ'ত অত্যন্ত স্বাভাবিক এক প্রক্রিয়া। এবং এই প্রকরণ কৌশলের সবসময় যে বিশেষ রাজনৈতিক তাৎপর্য থাকবেই এমন ঐতিহাসিক অনিবার্যতাবাদে আমাদের বিশ্বাস নেই।

জার্মান সমাজতাত্ত্বিক Maletzke-এর সংযোগের মডেলে দেখা যাচ্ছে বার্তা প্রেরণে প্রেরকের মনস্তাত্ত্বিক গঠন, সে নিজেকে কেমনভাবে দেখে অথবা দেখাতে চায় এসব ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। না হলে মোটামুটিভাবে একই রাজনৈতিক কাঠামোয় লালিত পরিচালক ওজু কেন স্থানু ফ্রেম ব্যবহার করা পছন্দ করেন অন্যদিকে কুরোশোওয়া মোবাইল ফ্রেম? সৃজনশীল শিল্পের কাঠামোয় যা সত্য তা গণমাধ্যমের জগতেও কার্যকরী (যদিও এখানে প্রেরকের স্বাধীনতা অনেকটাই সমাজনিয়ন্ত্রিত)। এছাড়াও আর একটা ব্যাপার মাথায় রাখা দরকার। যদি মিডিয়া নিঃসৃত বার্তায় সেরকম কোনো গূঢ় তাৎপর্য থেকেও থাকে দেখতে হবে সাধারণ উপভোক্তা তা বুঝতে পারছেন কিনা অথবা বুঝলেও তা কার্যকরী হচ্ছে কিনা। যদি তা না হয় তবে ঐ গূঢ় তাৎপর্যের স্ট্রিপটীজের মাধ্যমে হয়ত সমালোচকের ব্যক্তিগত মর্যাদাবৃদ্ধি হবে আসল কাজের কাজ অর্থাৎ সেই বিশেষ বার্তাটি জনমানসে কতখানি প্রভাব ফেলল তা প্রতিষ্ঠা করা আদৌ সম্ভব হবে না। অথচ এই ধরণের পণ্ডশ্রম সেমিওটিকস বিশারদেরা হরদম করে চলেছেন। যদি এই কাজের মাধ্যমে ক্রসওয়ার্ড পাজল সমাধানের তৃপ্তি তাঁরা পেতেন তা হলে তো ল্যাঠা চুকে যেত। কিন্তু তাঁরা এমন একটা ভাব দেখান যেন এসব কোডের অর্থ পরতে পরতে উন্মোচন করে জনসাধারণকে মারাত্মক সাংস্কৃতিক ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাচ্ছেন। যেখানে জনসাধারণ কোডটিকে ধরতেই পারছেন না সেখানে তাদের ক্ষতিটা হবে কোত্থেকে শুনি?

ক্রিটিক্যাল থিওরিস্টদের আরেকটা দুর্বলতা হচ্ছে উপভোক্তাদের নিষ্ক্রিয় ধরে নেওয়া। যেন সবাই অপাপবিদ্ধ ছিল, মিডিয়া এসে এদের সতীত্বহানি করে দিয়েছে। বিশেষ করে তথাকথিত প্রগতিশীলদের লেখালেখিতে তো এই মতটা যথেষ্ট প্রাধান্য পায়। গণমাধ্যমগুলোর যখন এতটা রমরমা ছিল না তখন নাকি মানুষ গুরুগম্ভীর চিন্তায় সতত নিরত থাকত। গণমাধ্যম বিশেষতঃ দূরদর্শনের প্রভাবে এখন ক্লেদাক্ত বিষয় নিয়ে চিন্তা করে যাচ্ছে, ওঁকারধ্বনির বদলে ক্লেংকারধ্বনি ক্ষেপন করছে।

আজকে মিডিয়ার প্রভাব বুঝতে গেলে আমাদের শুধু গণমাধ্যমের চৌখুপ্পিতেই আটকে থাকলে চলবে না, এর বাইরে যে জগৎ রয়েছে তাকেও আলোচনায় আনতে হবে। মিডিয়া আর সামাজিক জগৎ যে সব সময়ই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলে তা নয়; অনেক সময় এদের সম্পর্ক প্রতিস্পর্ধীরও। এসবের ঘাতপ্রতিঘাতে গড়ে উঠছে মিডিয়া মনন মিথষ্ক্রিয়া।

"আজকে মিডিয়ার প্রভাব বুঝতে গেলে আমাদের শুধু গণমাধ্যমের চৌখুপ্পিতেই আটকে থাকলে চলবে না, এর বাইরে যে জগৎ রয়েছে তাকেও আলোচনায় আনতে হবে। মিডিয়া আর সামাজিক জগৎ যে সব সময়ই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলে তা নয়; অনেক সময় এদের সম্পর্ক প্রতিস্পর্ধীরও। এসবের ঘাতপ্রতিঘাতে গড়ে উঠছে মিডিয়া মনন মিথষ্ক্রিয়া।"

যাইহোক, সামগ্রিকভাবে বলা যেতে পারে ক্রিটিক্যাল থিওরির যাবতীয় সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মিডিয়ার প্রভাব বুঝতে এই ধারাটিই সব থেকে ফলপ্রসূ ভূমিকা নিয়েছে। সেজন্য এ লেখাতে এই মতটিকেই সবচাইতে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে গণমাধ্যমগুলোর প্রকৃতি নিয়ে আলাদা করে আলোচনা করা হয়নি। দরকারমতো প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো বোঝাতে একটি বিশেষ মাধ্যমের আঙ্গিনা ছাড়িয়ে অন্য একটি মাধ্যম থেকে উদাহরণ চয়িত হয়েছে। তবে মাধ্যমগুলোর

মধ্যে দূরদর্শনের গুরুত্বই সর্বাধিক বলে তার প্রতি ঝোঁকটা দেওয়া হয়েছে একটু বেশী। ইচ্ছে করেই প্রতিটি আলাদা অধ্যায়ের আগে সব হেডিং বর্জিত হল। কেননা এতে বিষয়বস্তু ইচ্ছেমত প্রসারণের স্বাধীনতা মেলে অনেক বেশী। একটি বিশেষ সাবহেডিং দাবী করে অনেক বেশী ঠাসবুনোটের ট্রিটমেণ্ট। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে কয়েকটা

বেতার তরঙ্গের উদ্ভাবকরূপে তিনি এই কৃতিত্ব দাবি করতেই পারেন। সেই অনুষঙ্গের স্মৃতি জাগিয়ে তুলতে এই বিশেষণের অবতারণা। এ ছাড়াও বেতার তরঙ্গকে পরবর্তীকালে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তাতে একথার সারবত্তা অস্বীকার করা যায় না।)

শুরুতে যা সীমাবদ্ধ ছিল নিতান্তই কেজো তথ্য প্রেরণে তা হয়ে

"প্রথম মহাযুদ্ধ মিটলে ব্যাঙের ছাতার মত গজাতে থাকল একের পর এক বেতার কেন্দ্র। কিন্তু অচিরেই দরকার পড়ল কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের।"

মোটাদাগের পয়েণ্ট মাথায় রেখে আলোচনাটা এগিয়েছে যেমন: গণমাধ্যমের প্রকৃতি, তথাকথিত অপসংস্কৃতির বিস্তারে এর ভূমিকা, রাজনৈতিক প্রশ্নে গণমাধ্যমের অবস্থান ইত্যাদি। বোঝাই যাচ্ছে এই বিষয়গুলো আবার নিগূঢ়ভাবে একে অপরের সঙ্গে অন্বিত।

যেহেতু লেখাটা একবারে বসে গুছিয়ে শেষ করা হয় নি, সেহেতু প্রথমদিকে যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে পরের অংশ টায়টায় খাপ নাও খেতে পারে। কেউ কেউ এর মধ্যে ধারাবাহিকতার অভাবও খেয়াল করতে পারেন। এর পক্ষে শুধু একটি অজুহাতই খাড়া করা যেতে পারে। যেকোন লেখাই হচ্ছে বিকাশমান ব্যক্তিত্বের মত যেখানে পর্বান্তরের বাঁকে বিম্বিত হয় ভাবান্তরের সম্ভাবনা। শিরোনামে বলা হয়েছে বিচ্ছিন্ন প্রতিভাসের কথা। তাই কেউ এ লেখায় কোন অখণ্ড মানসপ্রতিমার দেখা পেতে চাইলে হতাশ হতে পারেন।

জীবের ধর্মই হচ্ছে নিজেকে প্রসারিত করে অন্যের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা। তার নিজের অস্তিত্বের প্রয়োজনেই সংযোগের সৃষ্টি। আর যে জীব নিজেকে অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ ভাবতে অভ্যস্ত তার কাছে সংযোগের প্রয়োজন তো আরো তীব্রভাবে অনুভূত হবেই। বলা বাহুল্য, সংযোগের সম্ভাবনা সভ্যতার গোড়ার দিকে ছিল সংকীর্ণ। গলার আওয়াজ, ঢাকের বাদ্যি বা ধোঁয়া যতদূর যেতে পারে ততদূরেই সীমাবদ্ধ থাকতো এদের প্রভাব। খুব বেশী তথ্যও এর মাধ্যমে পাঠানো যেত না।

এরপর এল পুঁজিবাদের সুবর্ণ যুগ। পুঁজি জিনিসটার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা; স্থানের বাধা সে গ্রাহ্যই করতে চায় না। দ্রুতগতিতে শেয়ার বাজারের হাল হকিকত জানাতে, যুদ্ধের কাজে দরকার পড়ল এমন মাধ্যমের যাতে থাকবে প্রচুর তথ্য প্রেরণের সুবিধা সেই সঙ্গে তুরঙ্গমতা। পুঁজিবাদ সওয়ার হলেন সমাযোজনের পক্ষীরাজে। সূচিত হল আধুনিক গণসংযোগের যুগ, শুরু হল বেতার তরঙ্গের ফ্যাসিস্ট দাপট। (ফ্যাসিস্ট অভিধাটিতে হয়ত অনেকেই ভুরু কোঁচকাচ্ছেন। তাই একটু প্রাঞ্জল হওয়া প্রয়োজন। বেতার তরঙ্গ আবদ্ধ থাকে সরু আঁটির মত রশ্মিগুচ্ছে। আবার এই আঁটিবদ্ধ লাঠির ইতালীয় নাম থেকেই ফ্যাসিস্ট শব্দটির উদ্ভব। পরিহাসচ্ছলে মার্কনি নিজেই একবার বলেছিলেন তিনিই হচ্ছেন প্রথম ফ্যাসিস্ট। দাঁড়াল বিনোদনের উপকরণ। প্রথম মহাযুদ্ধ মিটলে ব্যাঙের ছাতার মত গজাতে থাকল একের পর এক বেতার কেন্দ্র। কিন্তু অচিরেই দরকার পড়ল কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের।

প্রথমতঃ এত বেশি বেতার কেন্দ্র এত বিভিন্ন কম্পাঙ্কসম্পন্ন তরঙ্গ প্রেরণ করছিল যে তাতে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় লাটে ওঠার জোগাড়। হয়ত কেউ উড়োজাহাজে করে যাবার সময় অবতরণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ চাইছে সে সময় মাইক্রোফোনে ভেসে এল সুললিত বামাকণ্ঠের গান, বিমান চালকের মনের ভাবটা একবার ভেবে দেখুন। গানে নাকি আত্মা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে স্বর্গের সমীপে যাত্রা করে। এর চাইতে সরেস প্রমাণ আর মিলবে কোথায়, প্রয়োজনীয় নির্দেশ না পেয়ে বেচারি বিমান চালকের আত্মা সত্যি দেহের মায়া কাটিয়ে ওপর পানে যাবার জন্য বাক্স প্যাঁটরা গোছাচ্ছিল।

এতো গেল একটি দিক। আসলে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন পড়েছিল রাজনৈতিক কারণে। সেই সুপরিচিত মামদোভূত যা এ্যাদ্দিন বোতলবন্দী ছিল কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো আর ক্যাপিট্যালের পাতার ভেতর সে আজ বেরিয়ে এসেছে। এখন বেতার জিনিসটাকে যদি নিয়ন্ত্রিত না করা যায় তবে তো সেই বেয়াড়া বেতাল বেতার তরঙ্গ বাহিত হয়ে ঘরে ঘরে নটখট শুরু করে দেবে।

উনিশশো উনিশ সাল নাগাদ জার্মানিতে সৈনিক আর শ্রমিকদের মিলিত একটা স্বল্পস্থায়ী বিক্ষোভ দানা বেঁধেছিল। তারা সেনা-বাহিনীর বেতার কেন্দ্রে জোর করে ঢুকে পড়ে এবং তাদের উদ্দেশ্যের কথা ঘোষণা করে। বোঝাই যাচ্ছে এ জিনিস ব্রিটিশ কর্তাদের কতখানি ভয় পাইয়ে দিয়েছিল।

এভাবেই কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের ফাঁস এঁটে বসতে থাকল গণমাধ্যমের গলায়। সেই সঙ্গে তিমিঙ্গিলের মত অতিকায় বাণিজ্যসংস্থাগুলো জাঁকিয়ে বসতে থাকল গণমাধ্যমের পরিচালকের আসনে।

আর এভাবেই গণসংযোগ ব্যাপারটিতে জনগণ আর সংযোগ এ দুটো ব্যাপারই হয়ে পড়ল অনেকটাই গৌণ। এবারে খতিয়ে দেখা যাক, কিভাবে এই ব্যাপারটা ঘটছে। খুব সাধারণভাবে, যে কোন সংযোগ ব্যবস্থায় তিনটে উপাদান থাকে—প্রেরক, বার্তা আর প্রাপক। গণসংযোগের প্রেরক অংশে বলা বাহুল্য জনসাধারণের বকলমায় হাজির

থাকছে একটি বিশেষ এলিট শ্রেণী, কারণটা সহজবোধ্য। গণমাধ্যম ব্যাপারটি এত ব্যয়বহুল যে তা এলিট শ্রেণীর কুক্ষিগত না হয়ে পারে না। তবে জনসাধারণ থাকছে কোথায়? অবশ্যই প্রাপক হিসেবে তারা সদাই হাজির। আগেকার গণসংযোগের মডেলে ধরে নেওয়া হত জনসাধারণ অবস্থান করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, এদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ নিতান্তই ক্ষীণ। হালফিলের গণসংযোগবিশারদেরা বলছেন যে জনসাধারণ থাকে কোন opinion leader কে ঘিরে পুঞ্জীভূত

"মার্শাল ম্যাকলুহান আশা করেছিলেন যে দূরদর্শনের মত শক্তিশালী গণমাধ্যম মানুষের চৈতন্যকে সম্প্রসারিত করে সকলকে একই ধরনের অভিজ্ঞতার অংশীদার করবে।"

অবস্থায়। এই opinion leader রা হলেন সমাজের একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী যাঁরা জনরুচি গঠনে সক্রিয় অংশ নেন। জনগণ যে ভাবেই থাকুক না কেন একটা ব্যাপার পরিষ্কার : গণসংযোগের নীতিনির্ধারণে এদের ভূমিকা প্রায় নেই।

এবারে সংযোগের ব্যাপারটায় আসা যাক। আমরা যখন মুখোমুখি কথা বলি তখন বার্তার প্রবাহ থাকে উভমুখী। অর্থাৎ আমি কিছু একটা বললাম, তা শুনে আমার সঙ্গী কোন মন্তব্য করল অথবা কোন একটা বিশেষ ভঙ্গি করল যা আবার আমার চিন্তা, কথা অথবা শরীরি ভাষাকে একটা বিশেষ অভিমুখিতায় চালিত করল। একে বলা হয় Orthocommunication.

কিন্তু গণসংযোগে এই বার্তার প্রবাহ হয়ে পড়ে বিপজ্জনকভাবে একমুখী। এই যে Paracommunication এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রেরক এবং প্রাপকের মধ্যে ফিডব্যাক প্রক্রিয়াটি প্রায় তলানিতে গিয়ে ঠেকা। গণসংযোগের একটি পুরনো এবং প্রভাবশালী মডেলে (ল্যাসওয়েলের মডেলে) তো এই ফিডব্যাক ব্যাপারটিকে আদৌ হিসেবে রাখা হয় নি। তবে পরবর্তীকালের মডেলগুলোতে অতটা চরমপন্থী মনোভাব নেওয়া হয় নি। গণমাধ্যমগুলো চিঠিচাপাটির মাধ্যমে, ক্রেতাসমীক্ষা চালিয়ে কিছুটা এই অভাব দূর করার চেষ্টা করে। তবে বোঝাই যাচ্ছে ব্যাপারটা যথেষ্ট জুতসই নয়। গণমাধ্যমের কর্তাব্যক্তিরা মোটামুটিভাবে জনগণ নামের একটা বায়বীয় পদার্থের ধারণা করে নিয়ে তার উদ্দেশে নানারকম অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। বলা চলে জনগণ গণমাধ্যমের ধারণাটি তৈরী করে নি, গণমাধ্যমই জনগণ নামের ধারণাটি তৈরী করেছে। বি. বি. সির প্রথম দিককার দণ্ডমুন্ডের কর্তা রীথকে তাই বলতে শুনি, অধিকাংশ মানুষই জানে না তারা কি চায় অথবা কি চাওয়া উচিত তাদের তাই অবোধ জনসাধারণের স্বার্থে তাদেরকেই (বি. বি. সি) উপযুক্ত অনুষ্ঠান নির্বাচন করতে হবে। জনৈক সমালোচক মন্তব্য করেছেন যখন একজন গড়পড়তা মানুষ ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেন তখন তিনি জনগণ পদবাচ্য হন না আর সেজন্যেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি গণমাধ্যমে প্রচারিত হয় না। কেন হবে? গণমাধ্যমে তো

খালি প্রকৃত জনগণের অধিকার রয়েছে। তবে হ্যাঁ ধর্মঘট যখন তুলে নেওয়া হয় তখন পূর্বোক্ত মানুষটি আবার জনসাধারণরূপী হৃত সত্তা ফিরে পান এবং তখন তার জন্য গণমাধ্যমের দরজা হাট করে খোলা।

গণসংযোগের ক্ষেত্রে বার্তার উভমুখী প্রবাহের আয়োজনটা যুতসই না থাকায় মাঝেমধ্যেই প্রেরক আর প্রাপকের মধ্যে ভুল বোঝা-বুঝির অবকাশ থেকে যায় অর্থাৎ প্রেরক যা বলতে চাইছেন এবং প্রাপক যা বুঝছেন এ দুটো ব্যাপার আলাদা হয়ে পড়ে (পরিভাষায় যাকে বলে Isomorphism-এর অভাব)। গণমাধ্যম সংক্রান্ত আলোচনার জগতে একদা যিনি অতিতারকা বলে প্রতিভাত হয়েছিলেন সেই মার্শাল ম্যাকলুহান আশা করেছিলেন যে দূরদর্শনের মত শক্তিশালী গণমাধ্যম মানুষের চৈতন্যকে সম্প্রসারিত করে সকলকে একই ধরনের অভিজ্ঞতার অংশীদার করবে। শেষ মেশ ব্যক্তির মননের পেছনে তার মাথা আর থাকবে না, থাকবে দূরদর্শনের পরিচালক গোষ্ঠীর হাত। গণমাধ্যমের প্যাগম্বর ম্যাকলুহান তার বাগাড়ম্বরের স্রোতে ভেসে যেতে যেতে একটা জিনিস খেয়াল করেন নি। যেকোন বার্তার অন্তর্নিহিত কোডকে কেবল একটা অর্থের চৌহদ্দিতে বেঁধে রাখাটা অসম্ভব।

উপভোক্তা ব্যক্তি তো আর নিকোনো স্লেটের মত মন নিয়ে দূরদর্শনের সামনে আসেন না, তিনি আসেন আগে থেকেই সুগঠিত কিছু ধারণাবলী নিয়ে। স্বভাবতঃই ব্যক্তির নিজস্ব মনস্তাত্ত্বিক গঠন, সে যে উপসংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করছে সেই উপসংস্কৃতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এসবই ছায়া ফেলে তার ডিকোডিং প্রক্রিয়াতে। এই যে একই কোডের আলাদা আলাদা পঠনের প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনা এই ব্যাপারটাকে বলে Polysemy। ডিকোডিং প্রক্রিয়াটিকে খুব সাধারণভাবে তিনটে ভাগে ভাগ করা যায়। এক হচ্ছে—হেগেমনিক ডিকোডিং। এখানে কোডটির যিনি প্রেরক তিনি যেমন চাইছেন প্রাপক ঠিক সেরকমটিই পাঠ করছেন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে—Negotiated এখানে পঠনের সামান্য হেরফের ঘটছে তবে মোটের ওপর তা প্রেরকের অভিলাষ অনুসারী (এ পর্যন্ত ম্যাকলুহানদের ইচ্ছের সাড়ে পোনের আনাই ফলে যাচ্ছে)। ঝামেলাটি বাধছে Counter hegemonic decoding নিয়ে। নামেই বলে দিচ্ছে যে এখানে পঠনটা হচ্ছে প্রেরকের ইচ্ছের 180° কোণে। স্বভাবতঃই ব্যক্তির মননটি তার প্রেরকের জিম্মায় আর থাকছে না। সংস্কৃতি থেকে সংস্কৃতিতে এই যে ডিকোডিং-এর রকমফের তার একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন বিদেশে ত্রাণ সামগ্রী পাঠায় তখন হাতে হাত মেলানোর প্রতীকটি ব্যবহার করে থাকে বন্ধুত্বের সূচক হিসেবে। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার কিছু আদিবাসী মানুষের কাছে ঐ করমর্দনে

সংহত হাতটি হয়ে দাঁড়াচ্ছে দাসত্বের প্রতীক। বহিরাগত একটি হাত যেন দেশীয় মানুষদের হাত ধরে টেনে আনছে তাকে দাস হিসেবে চালান করবার জন্য। আবার থাইল্যাণ্ডের মানুষের কাছে ঐ হাত ভৌতিক জগতের প্রতিভূ। কারণ মানুষের দেহের সঙ্গে যোগসূত্রহীন এক জোড়া হাত—প্রেত ছাড়া আর কার হবে? বলা বাহুল্য এদুটো আলাদা দৃষ্টিভঙ্গীই মার্কিনী ত্রাণ বিতরণে বাধার সৃষ্টি করেছিল।

বিরুদ্ধবাদীরা যুক্তি দেখাবেন এই যে উদাহরণটিতে তো প্রায় কনটেক্স বিবর্জিত একটি সিম্বলকে হাজির করা হল। কাজেই তার থেকে একাধিক অর্থ বের করে আনা তো সোজা। কোড যত পরিপ্রেক্ষিত থেকে আলাদা হয়ে পড়ে তত তার পঠনে আসে বৈচিত্র্য। যেমন ঃ— ব্যক্তির মানসিক গঠনের আঁচ পাবার জন্যে যে রর্শাখ কালির ফোঁটার পরীক্ষা চালানো হয় সেখানে পঠনের স্বধীনতা মেলে সবচাইতে বেশী।

কিন্তু একটি ছবির পর আর একটি ছবি যদি পরপর চলে আসত (যেমনটা ঘটে থাকে ছায়াছবির পর্দায়) তাহলে ডিকোডিং-এর ব্যাপ্তি অনেকখানি কমে আসত না কি? এক্ষেত্রে পুরো ছবির প্রবাহটাই চালিত হচ্ছে একটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে। তার ডিকোডিং-এর সময় সামঞ্জস্য বজায় রেখে প্রেরকের অভীপ্সার বিপ্রতীপে নতুন কোন সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। তবে কি ম্যাকলুহানই ঠিক? ছায়াছবি দূরদর্শন বা কমিক স্ট্রিপের সবরকমের ডিকোডিংই হবে Hegemonic বা Negotiated? এখানে আবার একটা কিন্তু আছে। যেহেতু ডিকোডিং হচ্ছে একটা সৃজনশীল প্রক্রিয়া সেহেতু তা দাবী করে প্রেরক তথা পাঠকের অখণ্ড মনোযোগ। কিন্তু স্বাভাবিক ক্ষেত্রে দূরদর্শন একজন মানুষ দেখে কিভাবে? হয়ত দর্শক খেতে বসেছেন বা টেলিফোন পেয়ে উঠে চলে গেছেন, পাশের ঘরে তারস্বরে হয়ত রেকর্ড চালানো হয়েছে, সব মিলিয়ে পরিস্থিতিটা নিরবিচ্ছিন্ন মনঃসংযোগের পক্ষে অন্তরায়। পরিভাষায় একে বলে **Tertiary viewing**। বিলেতে তো আবার এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ঘন ঘন বিজ্ঞাপনের অনুপ্রবেশ। ফলে দর্শক ছবি দেখেন খামচে খামচে, তার ডিকোডিংও চলে ল্যাংচে ল্যাংচে। দর্শক যেটুকু অংশ দেখার সুযোগ হারালেন তা ভরিয়ে তোলেন নিজস্ব কল্পনা দিয়ে। এর ফলে আমরা পাচ্ছি এমন একটা নকশিকাঁথা যেখানে Figure বা মূল মোটিফটা তৈরী হয়েছে দূরদর্শনে প্রচারিত অনুষ্ঠানের খণ্ডাংশ দিয়ে আর তার গ্রাউণ্ডটা পেশ হয়েছে দর্শকের নিজস্ব সর্জনা দিয়ে।

দর্শকের এই নিজস্ব কল্পনাশক্তির মিশেল তার ডিকোডিং ক্ষমতায় এনে দিল আরো বেশী বৈচিত্র্য। কাজেই এখনও Counter Hegemonic decoding-এর সম্ভাবনা রয়েই যাচ্ছে।

এতক্ষণের আলোচনাতে ধরে নেওয়া হয়েছে যে কোন একটি কোডের প্রাপক প্রেরিত কোডটির তাৎপর্য উদ্ধারে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু এমনটা ঘটতেই পারে যে কোডটি প্রাপকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিরিখে এমন কোন মহিমাবিন্দুতে উন্নীত হল না যে সে বিন্দু থেকে সংযোগের যৌথ পদচারণা চলতে পারে। সোজা কথায় প্রাপক বার্তাটির সঙ্গে কোন রকম ইনভলভমেণ্ট বোধ করছেন না। কাজেই তা বোঝার বা নিজের জীবনের সঙ্গে মেলাবার কোন চেষ্টাই অবান্তর। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে ব্রিটিশ দূরদর্শনের একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের কথা যেটি নানা রকমের অর্থবহতা নিয়ে ধরা দিল বিভিন্ন গোষ্ঠীর কাছে। কিন্তু সেই একই অনুষ্ঠান কলেজে পাঠরত কিছু কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্রদের কাছে কোন দ্যোতনাই নিয়ে এল না। অনুষ্ঠানটিতে যাদের দেখান হয়েছে তাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব বাড়ী গাড়ী আছে। পরিবারের সংযুতিও অটুট। কিন্তু ঐ কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্ররা কি দেখতে পাচ্ছে? তাদের পরিবার ভগ্নকাঠামো নিয়ে ধুঁকছে; তাদের নিজস্ব বাড়ী গাড়ী থাকা তো দূরের কথা নিজস্ব অভিজ্ঞানটুকুও প্রায় নেই। তারা কি করে এরকম একটি অনুষ্ঠানের সঙ্গে একাত্ম বোধ করবে? যাই হোক, একটা ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে যে সমাজে যতদিন বিভিন্ন সংস্কৃতির স্তর থাকবে (এবং তা থাকবেই; এমন কোন বুলডোজার আবিষ্কৃত হয় নি যার মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তর সমীকৃত হতে পারে) ততদিন ডিকোডিং-এর বিভিন্নতা চলতেই থাকবে (উমবের্তো একোর ভাষায়, সেমিওটিক গেরিলা ওয়ারফেয়ার)। আর তার ফলে দূরদর্শনের মতো শক্তিশালী গণমাধ্যমও একই রকম ভাবধারা প্রচারের ক্ষেত্রে সফল হবে না।

"দূরদর্শনের মতো শক্তিশালী গণমাধ্যমও একই রকম ভাবধারা প্রচারের ক্ষেত্রে সফল হবে না।"

পাদটীকা ঃ—* সেরেণ্ডেপিটি কথাটি এসেছে একটি রূপকথার গল্পের তিন যুবরাজের মজাদার কাণ্ডকারখানার কথা থেকে। এদের সবচাইতে অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হল দৈবক্রমে এরা নানারকম ভালো ভালো আবিষ্কার করে ফেলত।

খুব সম্ভবতঃ হোরেস ওয়ালপোল কথাটি চালু করেন দৈবাৎ কোন তাৎপর্যপূর্ণ আবিষ্কারের ঘটনা বোঝাতে। জনৈক প্রাবন্ধিক সেরেণ্ডিপিটি কথাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সরস একটি উদাহরণ দিয়েছেন। ধরা যাক, কোন যুবক খড়ের গাদায় সুঁচ খুঁজছে, সুঁচ না পেয়ে সেই গাদায় যদি চাষীর তরুণী মেয়েকে সে খুঁজে পায় তবে সেটা হবে সেরেণ্ডিপিটির উদাহরণ।

বাংলার তাঁত ও হস্তশিল্প ঃ
ক্রেতার গৌরব, রুচির পরিচয়

বাংলার তাঁত ও হাতের কাজের আজ জগতজোড়া কদর। না দেখলে বিশ্বাস হয় না যে কত সামান্য দেশজ উপকরণ সম্বল করে আমাদের শিল্পী-কারিগররা তাঁদের পণ্যসম্ভারকে কি অসামান্য শিল্পকৃতির পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারেন।

শারদোৎসব-বাঙালী সংস্কৃতির অনন্য প্রকাশ। শান্তিপুরী ধুতি, তসরের পাঞ্জাবি, বালুচরী আর সিল্কটাঙ্গাইল শাড়ীর ভিড় যেন লেগেই থাকে। বসার ঘরে সাজিয়ে রাখি বাঁকুড়ার ঘোড়া, বিষ্ণুপুরী দশাবতার তাস, বেত ও কাঠের নানা শিল্প নিদর্শন।

ন্যায্যদামে এসব জিনিস পেতে হলে আপনাকে তন্তুজ, তন্তুশ্রী, মঞ্জুষা, গ্রামীণ ও চর্মজের দোকানে আসতেই হবে। বাড়তি লাভ বিশেষ রিবেট তো আছেই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই, সি, এ 4484/90

বই পরিচিতি

ইউরোপ আমেরিকা ছাড়া অন্য দেশেও বই ছাপা হয়

বইয়ের দোকানে গেলে মনে হয় দুনিয়ার তাবৎ বই লেখা বা ছাপা হয় বিলেত কিংবা আমেরিকায়। কভার খুললেই দেখা যায় প্রকাশকের ঠিকানা হয় লণ্ডন বা নিউ ইয়র্ক। তার মানে কি অন্য দেশে বই লেখা হয় না? অবশ্যই তা নয়। লেখা ঠিকই হয়। ছাপাও হয়। দুর্ভাগ্য, আমাদের দেশের বাজারে এসে তা পৌঁছয় না। এখনও আমাদের দেশে যত বই আমদানী হয় তার নব্বই শতাংশ আসে ওই দুদেশ থেকে। ফলে দুনিয়ার বিরাট অংশের মানুষের ভাবনা চিন্তা কাজকর্ম আমাদের অগোচরে থাকছে। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশের সাথে আমাদের কোনই যোগসূত্র নেই। যা আছে তা ঐ উন্নত দেশের হাতঘুরে।

এই অভাব দূর করতে এগিয়ে এসেছে Third World Bookstore। এরা কেবলমাত্র তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির বই-পত্র লেনদেন করবেন বলে ঠিক করেছেন। তবে নামটা এর মধ্যে একটু বদলেছেন। তারও কিছু কারণ ছিল। এদের নাম ও ঠিকানা :

Other India Bookstore
Above Mapusa Clinic
Mapusa. 403 507 Goa, India

বইয়ের লিষ্ট ওদের কাছে লিখলে পাওয়া যাবে। আমাদের দেশে প্রকাশিত বিশেষকরে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রকাশিত বই বিদেশে প্রচার এবং বিক্রির জন্যও এদের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

Other India Bookstore এ পাওয়া যাচ্ছে এমন কয়েকটি বইয়ের পরিচিতি দেওয়া হল।

ENVIROMENT

The Bhopal Tragedy

By Morehouse & Subramanium

Still the best account of the Bhopal gas disaster and how it occured. Also Calculates damages. Introduces the reader to the horrendous situation of workers in similar plants in the USA.

CIPA Rs. 50 PP 190

Papan Radioactive Waste Dump Controversy

This book is an indepth report of the events leading to the sitting of a dumpsite in Papan Malaysia, to store radio-active materials. It records the populer agitation against the project.

SAM Rs. 15 ; PP. 82

The State of Indias Environment, Vol I

CSE Rs. 100

Environmental Activist's Handbook

By G. Singh & M. Rao

Vital Comperdium of legal information for environmental activists in India.

Asha kendra Rs. 75 ; PP. 203

One Straw Revolution

By Masanoble Fukuoka

One extraordinary book about agriculture modern science and education that will transform your life.

FRC Rs. 30 ; PP.281

Rice in Abudance for All Times

By Dr. R. H. Richharia

In this book, financed purcly from his personal savings and a bank loan, this eminent rice scientist offers a practical guide for enhancing the produ tion of rice, using local Indian varieties.

Rs. 65 ; PP. 132

Mother Nature

By N. G. Hegde

A simple story for children about the hazards of deforestation and how an individual commened the process of regeneration. Colourfully illustrated.

BAIF Rs. 5 ; PP 20

Cry the Beloved Narmada

By Baba Amte

Baba Amte, the charismatic social worker and opponent of large dams writes an Impassioned but learned appeal to the nation on the proposal damming of the Narmada River Maharogi Seva Samity.

Rs. 10 ; PP 44

Temples of Tombs

By Darryl D'Monte

The prominent environmental journalist takes time out to study the environmental crises

generated by three major projects :—Silent Valley, the Mathura Oil Refinery and the Ihal Vaishet plant. Extremely useful study for it exhaustively analyses each project and suggests alternatives.

CSE Rs. 68 ; PP 285

Nuclear Energy and the Kaiga Project

An introduction to the Kaiga nuclear project and its implications

GRID Rs. 5 ; PP 34

The Gas Chamber on the Chambal

By V. T. Padmanavan

A study of the polution caused by the Gwalior Rayon Mills at Nagda, Vjjain.

PUCL Rs. 4 : PP 68

The Bhopal Verdict : Justice or Auction

A useful, timely compilation of views appearing in the press immediately after (and on) the Supreme Court Feb 14 Settlement order.

LRSA Rs. 15 PP 54

HEALTH

Anti Alcohol Booklet

A booklet highlighting the ways in which alcohol ruins the consumers.

CAP Rs. 6 ; PP 19

Anti-Sugar Booklet

A booklet highlighting the ways in which white sugar can damage your system and cause un-wanted problems.

ORT and the Credibility Gap

by Vimal Balasubramanyam

Even educated people die of dehydration after suffering diarrhoea because most still do not know about this simple therapy for the illness.

CED Rs. 3 PP 10

Where There is No Docter

By David Warner

This is not a conventional medical book. Designed for homes, sub-centres and dispensaries ; it enables a reasonably educated person to acquire enough knowledge what to do in an emergency and about preventive health care for the village community. Spacially adopted for India. Also available in Hindi, Bengali, Marathi, Napali, Tamil, Telegu, Urdu at more or less equivalent prices.

VHAI Rs. 33 PP 510

The Feeding and Care of Infants and young Childrcn

By Shanti Ghosh

An anthoritative interpretation of the best ideas from recent Indian research on child care and nutrition.

VHAI Rs. 26 PP 190

Ayurvedic Principles of Food and Nutrition

On the Ayurvedic science of nutrition. Most of the material is based on a workshop on this subject held in Kerala.

LSPSS Rs. 30 ; PP 95

সংকলক ঃ রবীন চক্রবর্তী

ছড়া

খবর

'ডাইনির তুকতাকে
মারাদোনা কুপোকাৎ,'
তাই নাকি? তাই নাকি?
কেয়াবাৎ! কেয়াবাৎ!

যুক্তি

প্রগতিশীল দাদার হাতে
নীলা পলার, বাহার,
'একটা কিছু আছেই আছে'
যুক্তি হল তাহার।

ভেল্‌কি

ভেল্‌কি দেখে
ভুলছো কে কে?
হচ্ছে মিছেই অজ্ঞান,
সত্যি কথা
বল্‌ছি শোনো,
সবের মূলেই বিজ্ঞান।

ভূপালের গ্যাস পীড়িত মানুষের লড়াই আজও শেষ হয়নি

ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার পর ছ' বৎসর অতিক্রান্ত। ছ'বৎসর আগে শীতকালের এক রাতের অন্ধকারে ভূপালের ঘুমন্ত মানুষদের ওপর নেমে এসেছিল এক ভয়ংকর বিষবাষ্প—পাশের কার্বাইডের মিথাইল আইসোসায়ানেট কারখানা থেকে। তাৎক্ষণিক মৃতের সংখ্যা বেশ কয়েক হাজার। মানুষ ও গবাদি পশু মিলে গত ছ'বছরে হাজার হাজার গ্যাস পীড়িত পঙ্গু মানুষ তিল তিল মৃত্যুর অপেক্ষায়।

সঠিক চিকিৎসার উপায় কেউ জানে না। ইউনিয়ন কার্বাইড কর্তৃপক্ষ জানলেও সে তথ্য চেপে রেখেছে। ভারত সরকার এই মর্মে গবেষণার কাজে বেশ কিছু অর্থ ব্যয় করেছে। ভারতীয় ডাক্তার বিজ্ঞানীরা বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারেননি। ফলে মামুলি চিকিৎসা ব্যবস্থাই বহাল এখনও। সবই স্বল্পকালীন ব্যবস্থা। দীর্ঘস্থায়ী নিরাময় দূরঅস্ত।

ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজে সরকার 130 কোটি টাকার মত ব্যয় করেছে। কাজের কাজ কমই হয়েছে। ইতিমধ্যে গত অষ্টআশী সালের আগষ্ট মাসে ভূপালের গ্যাস পীড়িত মহিলা উদ্যোগ সংগঠনের বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে সুপ্রীম কোর্টের সমীপে এক আর্জি পেশ করে। এ বছর মার্চ মাসে সুপ্রিম কোর্ট ভারত সরকারের উদ্দেশ্যে এক আদেশ জারী করেছে। তাতে বলা হয়েছে গ্যাস পীড়িত 36 টি মিউনিসিপ্যালিটি ওয়ার্ডে প্রত্যেক গ্যাস আক্রান্ত ব্যক্তিকে অন্তবর্তীকালীন সাহায্য বাবদ মাসে দু'শো টাকা করে দিতে। তিন বছরের জন্য এ আদেশ বলবৎ থাকবে। এ টাকা দেওয়া হচ্ছে। তবে এ নিয়ে অভিযোগের অন্ত নেই। সাহায্য প্রাপকদের নানাভাবে হয়রাণ হতে হচ্ছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঘুষ দেওয়া-নেওয়ার অভিযোগও উঠেছে।

ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা নির্দ্ধারণে নিযুক্ত মধ্যপ্রদেশ সরকারের অধীনস্থ ডাইরেক্টরেট অব ক্লেইমস্। অসুস্থের সংখ্যা, অসুস্থতার মাত্রা অনেক ক্ষেত্রে নেহাত মর্জিমাফিক ঠিক করেছেন এঁরা। এদের এক হিসেবে দেখা যাচ্ছে তিন লক্ষ সাতান্ন হাজার দাবী পত্রের মধ্যে মাত্র চল্লিশ জনকে এরা স্থায়ীভাবে পঙ্গু বলে ঘোষণা করেছেন। আর শেষ পর্যন্ত মৃতের সংখ্য এদের মতে 3787। যদিও উভয় ক্ষেত্রে প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশী।

গত ঊনআশী সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারত সরকার এবং ইউনিয়ন কার্বাইডের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে সুপ্রীম কোর্ট যে রায় দেয় তার বিরুদ্ধেও এই মহিলা উদ্যোগ সংগঠনের তরফে আপীল করা হয়। এখনও এই মামলা ফয়সলা হয়নি। হয়তো চলবে আরও বহুদিন। যত দেরী হবে অপরাধী বহুজাতিক কোম্পানী শাস্তি এড়িয়ে চলতে পারবে ততদিন। এই দীর্ঘস্থায়ী লড়াই চালিয়ে যেতে সকলের সমর্থন ও সহযোগিতা চাইছে "ভূপাল গ্যাস পীড়িত মহিলা উদ্যোগ সংগঠন। এদের ঠিকানা ঃ

BHOPAL GAS PEEDIT MAHILA UDYOG SANGATHAN
51, Rajendra Nagar, Bhopal—462010

সংকলক ; রবীন চক্রবর্তী

এই পৃথিবীর কোন দেশে আর কোন ভূপাল নয়

পরিক্রমা

কেন এই ছলাকলা ?

জাতীয় ক্ষেপণাস্ত্র কেন্দ্র উড়িষ্যার বালিয়াপাল ভোগরাই অঞ্চলে স্থাপন করার সরকারি অপচেষ্টাকে প্রতিহত করে চলেছেন স্থানীয় জনসাধারণ সুদীর্ঘ ছয় বৎসর। স্বদেশে ও বিদেশে অভিনন্দিত হয়েছে এই প্রতিরোধ আন্দোলন। পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে ও মানবাধিকারের স্বপক্ষে পরিচালিত এই আন্দোলনের একটি বড় দিক হচ্ছে "যুদ্ধ নয় শান্তি" এই আপাত অহিংস বুলি কপচানো রাষ্ট্রনেতাদের যুদ্ধবাজ চরিত্রকে উন্মোচিত করা। দক্ষিণ এশিয়াতে ক্রমবর্দ্ধমান মার্কিন যুদ্ধ-ঘাঁটিগুলির সংখ্যা দেখে তাদেরই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিধর সোভিয়েত ইউনিয়ন বিচলিত এবং যে কোন মূল্যে ভারতে জাতীয় ক্ষেপণাস্ত্র কেন্দ্র বসাতে তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এতে নাকি দুই বৃহৎ শক্তিধরের শক্তির ভারসাম্য বজায় থাকবে এশিয়া মহাদেশের এই দক্ষিণ অঞ্চলে। প্রাথমিক সমীক্ষাতে বাছাই করা হয়েছিল এই উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের জন্য কন্যাকুমারিকা, শ্রীহরিকোটা, আন্দামান, বালিয়াপাল, দ্বারকা, সাতভাইয়া ও সাগরদ্বীপ ইত্যাদি। অবশেষে বালিয়াপাল হয়ে পড়ে সবচেয়ে পছন্দসই স্থানটি। যাইহোক যুদ্ধবাজদের আপ্যায়ণ বালিয়াপালের সংগ্রামী মানুষদের হাতে কেমন হয়েছে, তা সর্বজনবিদিত।

হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে উঠল চিত্ত গত চৌঠা ডিসেম্বর সকালে প্রভাতী সমাচার পত্র দেখে। বিজু পট্টনায়ক বলেছেন সাগরে ক্ষেপণাস্ত্র কেন্দ্র স্থাপনে বসু রাজি। খবরটি দ্রুত সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়লো এবং স্বভাবতই বিভিন্ন স্তরের মানুষজনের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া দেখা গেলো। পরদিন কাগজে বসু মহাশয়ের কথা ছাপা হলো। তিনি বললেন—কোন প্রতিশ্রুতি দিই নি। মানুষজন যেন একটু আশ্বস্ত হতে পারলেন। কিন্তু তাঁদের বিস্মিত হতে হলো আরো কয়েকদিন পর নয়ই ডিসেম্বর কাগজে দেখা গেলো বিজু পট্টনায়ক বলেছেন—বসু রাজী একথা বলিনি। এবং "বিকৃত সংবাদ" পরিবেশনের জন্য তিনি উড়িষ্যার সাংবাদিকদের তিরস্কারও করলেন। বললেন ওটা ছিলো তাঁর নেহাত রসিকতা!

বিষয়টির মধ্যে সত্যাসত্য যাই থাক, আমাদের কাছে দিনের আলোর মত সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছিল দুটি দিক প্রথমতঃ এ রাজ্যে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী রাজনৈতিক নেতারা পরিবেশ-সচেতনতার পরিচয় রেখেছেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁদের প্রতিবাদ শুধু স্থান নির্বাচনে—মূল যুদ্ধাস্ত্র প্রকল্পটির বিরুদ্ধে নয়।

নোবেল সাহিত্যিকের পরিবেশ চেতনা

গত 11ই ডিসেম্বর ষ্টকহোমে সাহিত্যে নোবেল-পুরস্কার গ্রহণ করতে গিয়ে অক্তাভিও পাজ বলেছেন—আজ এ গ্রহের অস্তিত্ব বিপন্ন। তার কারণ পরিবেশের বিরুদ্ধে মানবজাতির অপরাধ। তিনি বলেছেন সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক শুনি, প্রকৃতির সাথে একটা ঐক্যবোধ আসে মনে। বস্তুতঃ কীটপতঙ্গ পাখি গাছপালা মানুষ সব মিলে গড়ে তুলেছে এক অচ্ছেদ্য জীবন শৃংখল। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের তথা পরিবেশ আন্দোলনে যুক্ত ব্যক্তিবর্গের মানসিকতা যখন এক নোবেল লরিয়েটের ভাবনার সাথে একই ধারায় বয়ে যায় মনে এক প্রশান্তি আসে অবশ্যই। আরো দৃঢ় হয় সংগ্রামী প্রত্যয়। □

সংকলক—**বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইত**

শিশুরা কেমন আছে ?

* সহজে প্রতিরোধযোগ্য অসুখ বিসুখ ও অপুষ্টিজনিত কারণে 5 বছরের কম বয়সের প্রায় 40 হাজার শিশু প্রতিদিন মারা যায়।
* হাম, হুপিং কাশি এবং ধনুষ্টংকারে প্রতিদিন 8 হাজার শিশু মারা যায়। অথচ স্বল্পব্যয় সাপেক্ষ প্রতিষেধক ব্যবহার করেই এসব মৃত্যু প্রতিরোধ করা সম্ভব। প্রতিটি শিশুকে এসব রোগের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক টিকা প্রদানের মাথা পিছু ব্যয় 30 টাকারও কম।
* ডায়ারিয়াজনিত জলশূন্যতায় প্রতিদিন প্রায় 7 হাজার শিশুর মৃত্যু ঘটে। অথচ নামমাত্র খরচে এই মৃত্যু প্রতিহত করা যায়। ডায়ারিয়ার চিকিৎসায় ব্যবহৃত প্রতিটি লবণজলের প্যাকেটের মূল্য প্রায় দুটাকা।
* প্রতিদিন নিউমোনিয়ায় মারা যায় 6 হাজার শিশু—যা স্বল্পব্যয়সাপেক্ষ এণ্টিবায়োটিক দ্বারাই চিকিৎসা করা সম্ভব। চিকিৎসা খরচ গড়ে প্রায় 20 টাকা।
* প্রতিটি শিশুর পেছনে বার্ষিক 225 টাকারও কম ব্যয় করে তাদের অপুষ্টির হার ব্যাপকভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব।
* বিশ্বের সামরিক ব্যয়ভার মানবজাতির দরিদ্রতম অর্ধেক অংশের সম্মিলিত বার্ষিক উপার্জনের চেয়েও বেশী।

সূত্র ঃ ইউনিসেফ / SPUR, NOVEMBER, 1990

রিপোর্ট

সবুজ সংঘের বিজ্ঞান মেলা

গত 27শে ডিসেম্বর বরানগরের স্থানীয় ক্লাব সবুজ সংঘের উদ্যোগে চার দিন ব্যাপী এক বিজ্ঞান মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 36 বছরের সংগঠনের বিজ্ঞানমেলা আয়োজনের প্রয়াস এই প্রথম, ফলতঃ প্রথম ধাপের ভুল ত্রুটি অবশ্যই ক্ষমার্হ। মেলায় উপস্থিত ছিল দেবীগড় বিজ্ঞান বিকাশ, অনুসন্ধিৎসু, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা, সবিতারি বিজ্ঞান সংস্থা সহ 14টি ছোট-বড় বিজ্ঞান সংগঠন, মেলার সর্বাধিক আকর্ষণীয় বিষয় ছিল টেলিস্কোপে আকাশ চেনা, মাটির নীচে জীবন্ত সমাধি, ভেজাল পরীক্ষা, সর্প প্রদর্শনী, আগুনের ভেল্কি, অলৌকিকের কারসাজি ইত্যাদি। এছাড়াও ছিল বিভিন্ন সংগঠনের পোস্টার, স্লাইড, পত্র-পত্রিকা এবং বইপত্রের স্টল।

29শে ডিসেম্বর অমলেন্দু চক্রবর্তীর আলোকচিত্র সহ "মহাবিশ্বের রহস্যে" 30টি অপূর্ব স্লাইড প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এই অনুষ্ঠানটির শেষাংশ কিছুটা পরিচালনার ত্রুটিতেই ব্যাহত হয়। মেলায় জনসমাবেশ খুব বেশী না হলেও সবুজ সংঘের এই উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসনীয়। চার দিনই মেলাশেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল, এর মধ্যে মন্দির বাজার পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটির পরিবেশ সংক্রান্ত একাঙ্ক নাটক, গণবিষাণের গণসঙ্গীত, ইত্যাদি ছাড়াও ছিল শ্রুতি নাটক, পল্লীগীতি ইত্যাদি।

এই জাতীয় অনুষ্ঠানের আয়োজনে অবশ্যই স্পষ্ট হয় যে চারিদিকের অসুস্থ আবহাওয়ার মধ্যেও অবিরত বয়ে চলা মানুষের সুস্থ চিন্তাধারার চোরাস্রোতটা ক্রমশঃই ব্যাপক হচ্ছে। সবুজ সংঘের সদস্য এবং সদস্যাদের নজর কাড়া উৎসাহ উদ্দীপনা ও আন্তরিকতা ভবিষ্যতে আরও ব্যাপক ভাবে ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে বিজ্ঞান মেলা আয়োজনের ও সেই সঙ্গে বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসারের দাবি রাখে॥ □

বিজ্ঞান দরবারের ভ্রাম্যমান বিজ্ঞান প্রদর্শনী

গত 23শে নভেম্বর কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবার তাদের সংগঠনের 10ম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এক ভ্রাম্যমান বিজ্ঞান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে। নিরক্ষরতা, কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী প্রচারাভিযানের জন্যই এই ভ্রাম্যমান বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন। 8 দিনের এই মেলা নদীয়া জেলার গয়েশপুর, যাঁতরাপাড়া, সগুনা, শিমুরালী, মদনপুর ইত্যাদি এলাকা পরিভ্রমণ করে। প্রতিদিনই প্রদর্শনীর মূল বিষয়বস্তু ছিল সাপ নিয়ে সংস্কার, অলৌকিকের কারসাজি, শিশুস্বাস্থ্য, বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর ওষুধের ব্যবহার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অপব্যবহার, ইত্যাদি। সঙ্গে ছিল প্রচুর সংখ্যক স্লাইড, পোস্টার ও বইপত্র।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স্ক শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্র, হালিশহর বিজ্ঞান পরিষদ, নৈহাটী ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এ্যান্ড কালচার, শান্তিপুর সায়েন্স ক্লাব, নরম্যান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন ইত্যাদি সংগঠন এই ভ্রাম্যমান বিজ্ঞান মেলায় যথেষ্ট সহযোগিতা করে। প্রতিদিনই মেলার সঙ্গে সঙ্গে ছিল কুসংস্কার, নিরক্ষরতা, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী স্লাইড, চলচ্চিত্র, গান, নাটক, আবৃত্তি ইত্যাদির প্রদর্শন।

মেলায় দিনে গড়ে 1200-র মত জনসমাগম ঘটে। বিশেষতঃ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাপ, অলৌকিকের গোপন কারসাজির প্রদর্শন যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। অনুষ্ঠানে মহিলাদের অংশগ্রহণ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

মেলায় বিভিন্ন লোকের মতামত থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে এই জাতীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন ক্রমশঃই বিজ্ঞান চেতনা প্রসারে সহায়ক ভূমিকা নিচ্ছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার ও প্রসারে বিজ্ঞানের এ হেন ধারাবাহিক কর্মসূচী যথেষ্ট ফলপ্রসূ ভূমিকা নিতে পারে। □

প্রতিবেদক— **কাজল রায়**

With best compliments from :

M/s. JUPITER SERVICES

B. B. COLLEGE MORE, USHAGRAM
G. T. ROAD (EAST), ASANSOL-713303

চিঠি

কলিকাতার পরিবহন ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলার জন্য কি ট্রামই দায়ী ?

আপনাদের পত্রিকাতে উপরোক্ত লেখাটি প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ জানাই। এই প্রসঙ্গে দুই একটি মন্তব্য প্রাসঙ্গিক হবে মনে করে জানালাম।

(১) লেখা হয়েছে 'যে কটি ট্রাম রাস্তায় বের হয় তাকে বাস দিয়ে রিপ্লেস করলে দূষণের পরিমানে বিশেষ পরিবর্তন হবে না কারণ পরিবহনের থেকে মোট দূষণের পরিমানের তুলনায় ঐটুকু নগন্য বলা যায়।' কথাটি ঠিক, কিন্তু যেটা প্রয়োজন ট্রাম ও ট্রলিবাস ব্যাপকভাবে বাসকে রিপ্লেস করবে যাতে দূষণ খুব বেশী রকম ভাবে কমিয়ে আনা যায়। কিন্তু বর্তমানে কলিকাতার ভয়াবহ পরিবহন দূষণের 50% এর বেশীর জন্য দায়ী বাস।

(২) লেখা হয়েছে "আপাত দৃষ্টিতে ট্রামকে বাসের তুলনায় কম দূষণকারী মনে হলেও ট্রাম চালাতে যে বিদ্যুৎ লাগে তা আবার অন্যভাবে পরিবেশকে দূষিত করে।" কথাটা সম্পূর্ণ না হলেও প্রায় ভিত্তিহীন বলা চলে। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র শহর থেকে অনেক দূরে হওয়াতে সেখানে জনবসতি কম, সেজন্য কম সংখ্যক মানুষ দূষণের কবলে পড়েন। তাছাড়া মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের কতটুকুই বা ট্রামে ব্যবহার হয়? রেলওয়ে একই কারণে শহর ও শহরতলীতে ষ্টীম ও ডিজেল ইঞ্জিন না চালিয়ে বিদ্যুৎ ইঞ্জিন চালান। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের দূষণ নিয়ন্ত্রনের বহু নিয়ম ও উপায় আছে। গোটা চার-পাঁচ কেন্দ্রে ব্যবস্থা নেওয়া বেশী সহজ না চার পাঁচ লক্ষ গাড়ীর পেছনে খবরদারী করা বেশী সহজ? বিশেষতঃ যেখানে জন-সচেতনতা প্রায় নেই বললেই হয়। রান্নার গ্যাস যে পদ্ধতিতে পেট্রোলিয়াম থেকে তৈরী হয় তাতেও বায়ু দূষণ হয়। তাহলে কি আমরা শহরবাসীরা আগের কাঠ-কয়লা-ঘুঁটের উনুনে ফিরে যাবো? আসলে দূষণের মাত্রা ও স্থান একসঙ্গে বিচার করতে হয়।

ধন্যবাদ জানবেন

দেবাশিস ভট্টাচার্য্য

ছড়া

বাবার যাদু

'ফটোর গায়ে মন্ত্র দিয়ে
এনে দিলাম ছাই,
আমার জুড়ি কে আর আছে
বলেন বাবা সাঁই।'
'আমরা জানি গুরু তোমার
কেমিকেলের যাদু,
ধম্ম নিয়ে ধাপ্পা দিয়ে
ভালোই আছো চাঁদু।'

❋ * ❋

পেরেক বাবা

পেরেক পেতে শুয়ে আছেন
তিনি পেরেক বাবা,
আগুন খেয়ে বলেন তিনি—
'আমি আগুন বাবা।'
বাবা তোমার বিজ্ঞানেতে
ভালোই আছে জ্ঞান,
পেরেকবাবা আগুনবাবা
ব্যবসা করো ক্যান।

প্রো রে না টা

লিট্‌ল ম্যাগাজিন লেখক-কবি ডাইরেক্টরী (1991)-এর জন্য যত শীঘ্র সম্ভব নাম, ঠিকানা, জন্মসাল, লেখার বিষয়, সম্পাদিত পত্রিকা ও প্রকাশিত গ্রন্থের বিবরণ পাঠান—

প্রো রে না টা

21, ধর্মদাস কুণ্ডু লেন,
শিবপুর, হাওড়া : 711102

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর গ্রাহকদের প্রতি :

বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা বারো টাকা। বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। পত্রিকা ডাকে পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। সেক্ষেত্রে ডাক মাশুল সহ গ্রাহক চাঁদা পনেরো টাকা। "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী"—এই নামে ব্যাঙ্ক ড্রাফট্ বা মানি-অর্ডার করে টাকা পাঠাতে পারেন। কুপনের নীচে নাম ঠিকানার স্পষ্ট উল্লেখ প্রয়োজন।

প্রযত্নে : অভিজিৎ লাহিড়ী ॥ B-2 বৈশাখী ॥ 153/1 যশোহর রোড, কলিকাতা 700074 (ফোন : 59-7357)

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে! যদিও এখনও কিছুটা পেছিয়ে আছে। পুরোনো গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, যাঁরা এখনও তাঁদের গ্রাহক চাঁদা আমাদের কাছে পাঠাননি—যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটা পাঠিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন।

যদি কোন সংখ্যা এখনও না পেয়ে থাকেন আমাদের জানান, সম্ভব হলে পাঠানোর ব্যবস্থা করব।

পড়ে দেখুন

উৎস মানুষ / গণস্বাস্থ্য / গণদর্পণ / Safe Energy and Environment / বিশ্লেষণ / দ্বান্দ্বিক (দুর্গাপুর) / অহল্যা চেতনা, মানব পরিবেশ

যাঁরা কাজ করেছেন

কম্পোজ ● নারায়ণ পাল, রঘুনাথ নায়েক, স্বপন মাইতি, নারায়ণ পাত্র, তপন সামন্ত, বঙ্কিম মাইতি, নিতাই ঘড়া।

মেক্‌আপ্ ● নারায়ণ পাল।

মেশিনম্যান ● গোবিন্দ, নারায়ণ, বারীন, হারাধন।

বাইণ্ডিং ● কাওসর মিঞা।

মুদ্রক ● রামগোপাল মাইতি।

সম্পাদনায় ● বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইত, রবীন মজুমদার, সুদীপ্ত সরস্বতী, রবীন চক্রবর্তী ও শান্তনু ত্রিবেদী।

R. N. 34929/79
YEAR 14, NUMBER 1

A bi-monthly magazine
VIGYAN-O-VIGYANKARMI
C/o A. Lahiri
B2 Baisakhi, 153/1 Jessore Road, 700114
July-August 1990

নর্মদা বাঁচাও ঃ আন্দোলনরত বন্ধুদের পাশে দাঁড়ান

ঘাঁড়ি যুদ্ধের খবরের আড়ালে চাপা পড়ে যাচ্ছে গুজরাট-মধ্যপ্রদেশ সীমান্তে নর্মদা ধ্বংসকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানুষদের মরণপন সংগ্রাম। অনশনরত বন্ধুরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে তাঁদের লড়াই চলবেই কন্ট্রাক্টর, বড় আমলা, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক চক্রগুলোর বিরুদ্ধে। এই মুহূর্তে ভীষণ প্রয়োজন আন্দোলনের পাশে দাঁড়াবার।

আর্থিক বা অন্য কোনরকম সাহায্য করতে ইচ্ছুক সংগঠন, ব্যক্তি নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন
সি, 18/এ মধুরকা
নয়াদিল্লী ; 110067

নর্মদা মাটি নবনির্মাণ সমিতি
বড়বালী, জেলা-সরগোত
মধ্যপ্রদেশ ; 451551

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রবীন মজুমদার কর্তৃক ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে লক্ষ্মী প্রেস, ১৩০ কেশব সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত।